ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২৪ আগস্ট ১৯৭৯



জিতল কে ?



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ওয়াটারপোলোয় গতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন
রেলওয়েজ দল / পাহাড়ী রায়চৌধুরী

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ১৬ ।। ২৪ আগস্ট,১৯৭৯

কলকাতা ফুটবলের সেরা আকর্ষণ প্রথম ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নটি এবারে মীমাংসা হল তিন প্রধানের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার ফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার দরুন। মরশুমের সেরা আকর্ষণ ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানের খেলাটি এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে অমীমাংসিত হয়ে যাওয়ার পর মহমেডান স্পোর্টিং-এর কাছে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যেমন সুযোগ এনে দেয়, তেমনি দুই প্রধানের মধ্যে আবার খেলা হবে এই সম্ভাবনা ফুটবল 'অনুরাগীদের' মধ্যে এক অসাধারণ উত্তেজনার খোরাক জোগায়। ২১ জুলাই-এর খেলায় মোহনবাগানের কাছে মহমেডান স্পোর্টিং পরাজিত হলে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে যায়। কিন্তু তুরুপের তাস যে তখনও মহমেডান স্পোর্টিং-এর হাতে এটা অনেকেই বুঝতে পারেননি। ৪ আগস্ট ইস্টবেঙ্গলকে মহমেডান স্পোর্টিং রুখে দিল এবং সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মোহনবাগানের পক্ষে লিগ জয়ের সম্ভাবনা একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্ট হারিয়ে মোহনবাগান অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় বাকি খেলায় জয়লাভ করে। ১৯৭৮ সালেও একইভাবে মোহনবাগান লিগ পায়, তবে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করার একটা কৃতিত্ব ছিল।

ইস্টবেঙ্গল রানার্স হল অপরাজিতভাবে যদিও তারা তিনটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তবে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন ৭ জুলাই, ২১ জুলাই না ৪ আগস্ট নির্ধারিত হয়েছে—এটা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। কাজেই লিগের ভাগ্যলক্ষ্মী এবার কবে স্থির হয়ে বসলেন, এ বিচার রসিকজনদের ওপর ছেড়ে দিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে আমরা অভিনন্দন জানালাম।

সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০
বিমান মাশুল ঃ
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা







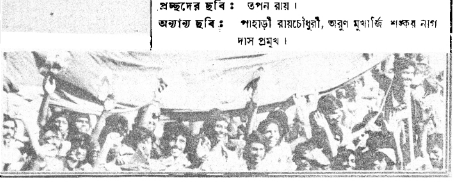
যা আছে

ফুটবল ঃ

ক্রিকেট ঃ

অন্যান্য ঃ

কার্টুন ঃ রাজা, আলি ও পি জি
প্রচ্ছদের ছবি ঃ তপন রায়।
অন্যান্য ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি শঙ্কর নাগ দাস প্রমুখ।



স্মরণীয় তেরই আগস্ট

স্টাফ রিপোর্টার অশোক চট্টোপাধ্যায়ঃ মনে হচ্ছিল মেলা দেখতে এসেছি। ফুটবল ম্যাচের কোন টেনসন নেই, মোহনবাগানের সমর্থকরা স্থির-নিশ্চিত ছিল ম্যাচ তারা জিতছেই। বিরাট পতাকা, মুহুর্মুহু পটকার আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে, আবির উড়ছিল লাল সবুজ রঙের। মাঠের বাইরে কোথায় যেন একটানা তাসা বেজে যাচ্ছিল।

গ্যালারিতে দুটি কিশোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মোহনবাগানের সপ্তদশ লিগ জয়ের রেকর্ড প্রত্যক্ষ করতে এসেছে।

—আমরা তাহলে লিগ পেয়ে গেলাম।

—প্রায় তাই, তবু খেলাটা শেষ হতে দে। ক্যাপ্টেন দিলীপ পালিত কি আজ খেলবে? স্ট্রাইকার খেলবে নিশ্চয় পায়াস আর শ্যাম, দুই উইং-এ মানস আর বিদেশ। এবার লিগ পাওয়ার ব্যাপারে মানস সবচেয়ে বড় সহায় ছিল। মোহনবাগান তো এবার বেশীর ভাগ খেলাতেই দুই উইং দিয়ে ঝড়ের গতিতে আক্রমণ চালিয়েছে।

—তুলনায় বিদেশ ছিল অনেকটা নিষ্প্রভ। বিদেশ আক্রমণের জন্য মানসিক ভাবে যতটা ফু'সে উঠছে, খেলায় সব সময় তার পুরোটা ধরা পড়ছে না।

—এবার আমাদের স্ট্রাইকার পজিশনটা একটু নড়বড়ে ছিল। কিন্তু আলাদা ভাবে ভেবে দ্যাখ্ জেভিয়ার পায়াস ভালো খেলেছে।

—প্রথমদিকে তো মনে হয়েছিল নতুন রিক্রুটদের মধ্যে পায়াস সবচেয়ে ভালো। বিপক্ষের ডিফেন্সের মধ্যে দিয়ে ও যে ভাবে বল নিয়ে ঢুকত, সেটা দেখার মত। এখন ও অনেকটা ভীতু হয়ে পড়েছে।

পোর্টের সঙ্গে খেলায় চোট পাওয়ার পর থেকেই পা বাঁচিয়ে খেলছে। স্পিডটাও যেন একটু কমে গেছে। আর আমাদের আছে শ্যাম থাপা।

—শ্যাম তো ট্রাম্প কার্ড। ওল্ড ইজ গোল্ড। রক্ষণভাগে তো সকলেই পুরনো খেলোয়াড়। গোলে প্রতাপ ঘোষ শুধু নতুন, দারুণ খেলছে কিন্তু ছেলেটা। শিবাজীকে এভাবে সরিয়ে দিয়ে ও যে এক নম্বর গোলকিপার হবে এটা ভাবা যায়নি সিজনের শুরুতে।

প্রথমার্ধের দশ মিনিটে মোহনবাগান প্রথম গোল করে। শ্যামল নিজেদের সীমানা থেকে লম্বা শটে বলটা ক্লিয়ার করে। বল উঁচু হয়ে আসে পায়াস আর বিদেশের মাঝখানে। পায়াস লাফিয়ে উঠে হেড করে। জগদীশ বলটা আয়ত্তে আনার জন্য গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং হাতে বলের নাগাল না পেয়ে কোনরকমে একটু পা ছোঁয়ায়। শ্যাম ফাঁকা গোলে লব করে বলটা ঢুকিয়ে দেয়।



পায়াস এমন আর কখনও দেখেনি/অরুণ

★

প্রথমার্ধের শেষে আবার সেই দুই কিশোর।

—পায়াসকে ভীতু বলছিলি? আক্রমণগুলোতো ওর দিক থেকেই—।

—পায়াস আর শ্যামের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা দারুণ। বিদেশ যে ভাবে বল নিয়ে এরিয়ানের রক্ষণভাগকে তছনছ করেছে, সেটা তারিফ করার মত।

—গোলটা কিন্তু জগদীশ নিজের দোষে খেল।

—তা ঠিক, তবে ও অনেকগুলো শট আটকেছে। এরিয়ানের সেণ্টার ব্যাক সমীরণ সাহা খুব দায়িত্ব নিয়ে খেলছে। ফরোয়ার্ড চারটেই বাজে। শুধু শুধু বল হোল্ড করে চান্স নষ্ট করছে।

—এরিয়ানের স্ট্রাইকার মোতি সিং কিন্তু একটা ভালো সুযোগ নষ্ট করেছে। দু'জন স্টপার ব্যাককে যেভাবে কাটিয়ে ও ভেতরে ঢুকলো, ভেবেছিলাম গোল হয়ে যাবে। কিন্তু একেবারে প্রতাপকে লক্ষ্য করে একটা দুর্বল শট নিল। ওতে গোল হয় না।

—এত লোক মোহনবাগান মাঠে আর কখনো দেখেছিস? গ্যালারি উপচে মাঠেও হাজার হাজার লোক বসে গেছে।

★

দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটে মোহনবাগান দ্বিতীয় গোল করে। ডানধার থেকে পায়াস বল নিয়ে দু'জন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে সেণ্টার করে। শ্যাম ডান পায়ে মাঝারি জোরে ছোট্ট শট নেয়। বলটা পোস্টের ভেতর দিকে লেগে গোল লাইন অতিক্রম করে (২-০)। এরিয়ানের খেলোয়াড়েরা শ্যামের এই দ্বিতীয় গোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল। অভিযোগ টেঁকেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটে মানস তার এই সিজনের ২৩তম গোলটি করে। গৌতম বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে লব করে বলটা মানসকে দেয়। মানস জোরালো শটে তৃতীয় গোলটি (৩-০) দেয়। মানসের এ গোলটি সমর্থকদের কাছে পৃথক তাৎপর্যপূর্ণ।

মোহনবাগানের এটি শেষ খেলা, মানস



খেলার আগে দুই অধিনায়ক কম্পটন ও নির্মল চ্যাটার্জি/শংকর



গোল—আনন্দে শ্যাম ভেসে উঠল শূন্যে, পায়াস প্রস্তুত শ্যামকে অভিনন্দন জানাতে/অরুণ

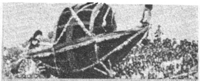
তাই সেরা গোলদাতার দৌড়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্বিরের থেকে যতটা এগিয়ে থাকতে পারে। সাব্বিরের এখন মানসকে টপকাতে হলে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে চারটে গোল দিতে হবে।

খেলার ৬১ মিনিটে এরিয়ানের মোতি সিং তার পুরনো ভুলের ক্ষতিপূরণ করে। আক্রমণের মুখে প্রতাপ গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলে মোতি ফাঁকা গোলে লব করে বলটা পাঠায় (১-৩)। প্রদীপ চৌধুরী চেষ্টা করেছিল হেড করে বলটা আটকাবার, পারেনি, কারণ বলটা প্রদীপের আয়ত্তের বাইরে ছিল।

★

খেলা শেষের বাঁশী বাজা মাত্র মনে হল মাঠের, চারধারে তার কাঁটার উঁচু ফেন্সিংগুলো যেন খাটো হয়ে গেল। জলস্রোতের মত জনস্রোতে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা কোথায় হারিয়ে গেল। পটকার আওয়াজগুলো যেন আরো জোরে হল। সবুজ লাল (মেরুন) আবীরের ঝড়ে সে মুহূর্তে মাঠে অন্য রং বলতে আর কিছু রইল না। মোহনবাগান অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন। সব কটা ম্যাচে জয়; একমাত্র ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র।

গ্যালারির সেই দুই কিশোর আনন্দে বোবা হয়ে গিয়েছিল। একসময় চকচকে চোখে ওরা দুজনে দু'জনের দিকে তাকাল! তারপর দু'জনেই একসঙ্গে গায়ের শার্টটা খুলে বিজয় পতাকা করে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া টপকে মাঠের ভিড়ে মিশে গেল।





শ্যামের হ্যাটি দ্বিতীয় গোল। বল সহ গোলরক্ষক জগদীশ গোলের ভিতরে। মানস সংঘর্ষ এড়াচ্ছে/পাহাড়ী



পায়াস ডিফেন্স ভিমছে এরিয়ানের/অরুণ



মোহনবাগান : প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, শ্যামল ব্যানার্জি, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াস, বিদেশ বসু।

এরিয়ান : জগদীশ ঘোষ, প্রাণগোপাল দাস (সমীর মুখার্জি), প্রণব চক্রবর্তী, সমীরণ সাহা, বিশ্বজিত বসু, দীপক ব্যানার্জি, প্রবীর ঘোষ, শংকর অধিকারী (বিশ্বজিত ভট্টাচার্য), মোতি সিং, দেবাশিস রায় ও নির্মল চ্যাটার্জি।

রেফারি : সুনীল [illegible]।

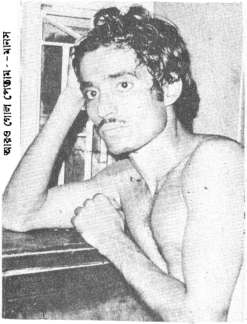
'এখনও অনেকটা পথ বাকি, এরপর রয়েছে শিল্ড'

স্টাফ রিপোর্টার হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ ওরা আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। খেলার শেষ তখন কয়েক মিনিট দূরে। এমন সময় মোহনবাগান ক্লাব সম্পাদক ধীরেন দে মাঠের মধ্যে সাইড লাইনের একেবারে গা ঘেঁষে ফুটবল সম্পাদক আর কে তেওয়ারির পাশে এসে বসলেন। মরশুমে এই দ্বিতীয়বার তিনি মাঠের মধ্যে এলেন। এর আগে ভ্রাতৃ সংঘের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ফেন্সিংয়ের ভিতরে ছিলেন। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, অধিনায়ক দিলীপ পালিত, প্রাক্তন গোলরক্ষক প্রশান্ত মিত্র, সন্তোষ বসু'রা আগেই টেন্টের দিকে পা বাড়াল ভিড়ের স্রোত এড়াবার জন্য।

সমাপ্তির আর বেশী বাকী নেই। একটা বিরাট উল্লাসে হারিয়ে যাওয়ার জন্য মোহনবাগান মাঠ ছটফট করছে। মাঠের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ বসে এবং দাঁড়িয়ে গেছে; যেন অর্জুনপুর মাঠে কোন টুর্নামেন্টের ফাইনাল চলছে। র‍্যামপার্ট উপচে পড়েছে। সি এ বি ক্লাব হাউসের উপর (এখানে এর আগে কোনদিন লোক জমায়েত হতে দেখিনি) এবং মোহনবাগানের দিকের কংক্রিট গ্যালারির মাথাতেও-শুধু কালো মাথার সারি। খেলা আরম্ভের অনেক আগে থেকেই পটকার আওয়াজ, গ্যালারির কোনো কোনো অংশে ব্যাণ্ড ও তাসা সহযোগে নাচ, মাইকে গান ও বেলুন।

শেষ বাঁশী বাজল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পি কে ব্যানার্জি, আমার বাঁ পাশে বসা বিদ্যুৎ মজুমদার, কয়েক গজ দূরে ধীরেন দে, আর কে তেওয়ারিরা দ্রুত পায়ে মার্চ করলেন মাঠের মধ্যে। খেলোয়াড়রা দু-হাত তুলে উল্লাস প্রকাশ করেই ত্বরিৎ গতিতে পালাতে চাইল টেন্টে। কিন্তু ততক্ষণে কয়েক হাজার মানুষ মাঠকে প্লাবিত করে ফেলেছে। ফেন্সিংয়ের ধারে খেলোয়াড়দের প্রবেশ পথের অনেকটা জায়গা জুড়ে তখন শুরু হয়ে গেছে উদ্দাম নৃত্য খেলোয়াড়রা ছিটকে গেল যে যার, ওদের তখন একটু স্পর্শের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে মোহন-ভক্তরা।

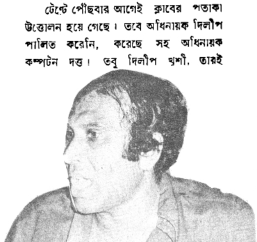
গ্যালারি ও সদস্য আসনে ব্যাণ্ড ও তাসার তালে তালে টুইস্ট শুরু হয়ে গেছে আগেই। মুহুর্মুহু পটকা ফাটছে, হাওয়াই উড়ছে, বিউগল বাজছে। খেলা চলছে আবিরের, মাঠের মধ্যে এবং দর্শক ও সদস্য আসনেও। দু একটা মশালও জ্বলছে ইতস্তত। মাঝে মাঝেই, থেমে থেমে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে একত্রিত করে সমস্বরে বিরাট



আরও গোল পেতাম — মানস

আওয়াজ তুলছে—'থ্রি চিয়ার্স ফর মোহনবাগান'। সেই চিৎকার ছড়িয়ে পড়ছে ময়দানের আকাশে। ওদের প্রিয় মোহনবাগান আজ এরিয়ানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ৭৯-র লিগ ঘরে তুলল। তিন বছর আগে, ৭৬-এ একই পরিস্থিতিতে এই এরিয়ানকেই শেষ ম্যাচে নামমাত্র গোলে হারিয়ে মোহনবাগান লিগ পেয়ে ছিল দীর্ঘ ছ'বছরের কালিমা ঘুচিয়ে। সেদিনের এরিয়ানের মানস ভট্টাচার্য আজ মোহনবাগানের লিগ জয়ের অন্যতম রূপকার। এক পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আনন্দ, উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনের এক বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করে ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম টেন্টের দিকে বিদ্যুৎ মজুমদার, প্রদ্যোৎ বর্মণ প্রমুখের সঙ্গে।

টেন্টে পৌঁছবার আগেই ক্লাবের পতাকা উত্তোলন হয়ে গেছে। তবে অধিনায়ক দিলীপ পালিত করেনি, করেছে সহ অধিনায়ক কম্পটন দত্ত! তবু দিলীপ খুশী, তারই



অধিনায়কত্বে দল লিগ জয়ের সম্মান পেয়েছে। তবে ক্যাপ্টেন আজ শেষ খেলায় মাঠে নামেনি। এবং এজন্য তাকে ব্যথাতুর মনে হয়েছে। কথা বলার সময় তার চোখে জল এসেছিল।

পি কে-র আরও বক্তব্য—ইস্টবেঙ্গল এত ভাল টিম করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না—সব সময় ভাল খেলতে পারেনি বলে।

আপনার টিমকে এবার সবচেয়ে বেশী বেগ দিয়েছে কোন্ দল? খুব চটপট উত্তর—অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল। আমাদের সঙ্গে ফার্স্ট হাফে দারুণ খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। তারপরেই রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের কথা বলব। এদিনের আগের ম্যাচে ওরা যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল। আমি টিমটাকে এক মাস কোচিংও করেছি। এবার নিয়ে আমি দু'প্রধানের কোচ চার বছর করে। বড় টিমের এই আট বছরের কোচিং-জীবনে কলকাতার লিগে আমি সাতবারই জিতেছি, শুধু '৭৭ সাল ছাড়া, আর শিল্ড জিতেছি আট বছরই (৭৬ ও ৭৮-এ যুগ্ম বিজয়ী)। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন কয়েকজন পি কে-কে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পি কে ক্যাসিয়াস ক্লে, পেলে, বর্গ, গাভাসকরের কথাও টেনে আনলেন। তার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল—ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচ নিয়ে কিছু বলুন! বললেন, ইস্টবেঙ্গলের জেতা উচিত ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখা **সুব্রত ভট্টাচার্যের** সঙ্গে, খালি গায়ে তোয়ালে জড়ানো। বলল—এবার আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই চ্যালেঞ্জ আমরা পার হয়েছি! অবশেষে লিগ জিতেছি।

প্রসূনের বক্তব্য—যারা আমাদের তিন নম্বর দল হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, আজ তাদের আমরা জবাব দিয়েছি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রমাণ করলাম—আমরাও কম নই। আমি আর বাবলু (সুব্রত) ৭৪ থেকে মোহনবাগানের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। ৭৫-এ পাঁচ গোল খাওয়ার কষ্টও আমরা পেয়েছি। আজ আমরা তাই সত্যিই আনন্দিত। হয়তো একটু বেশীই।

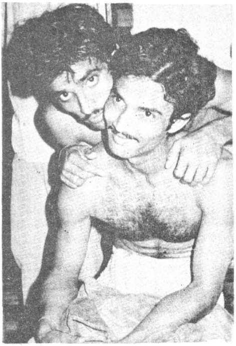
টেন্টে ঢোকার পথেই বাঁদিকের একটি ঘরে তখন পি কে বসে এবং ক্লাব সম্পাদক ধীরেন দে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলছেন—নেক টু নেক লড়াইয়ের পর আমার ক্লাব লিগ পেল। কোচকে অভিনন্দন জানাই, সে আমাকে সন্তুষ্ট করেছে। আমি তার উপরই টিমের দায়িত্ব পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, এখনও

অনেকটা পথ বাকি। এরপর রয়েছে শিল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স ইত্যাদি টুর্নামেন্ট। ছেলেরা যেমন লিগের সম্মান এনে দিল, তেমনি আশা করব অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও ওরা চেষ্টা করবে। ধীরেন দে'কে প্রশ্ন করেছিলাম : আজ কি আপনি গোড়া থেকে মাঠে উপস্থিত? 'ও, ইয়েস—আজ আমি গোড়াতেই এসেছি। তবে অত্যধিক ভিড় ছিল বলে পরে মাঠে ঢুকেছি। একেবারে শেষ দিকে।'

পি কে-র জামা একেবারে ভিজে চপচপে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার চোখে মুখে স্বস্তি। এইভাবে শুরু করলেন তিনি—অনেক কিছু সত্ত্বেও আমার টিম লিগ জয় করল। আমি আমার সম্মান বজায় রেখেছি। আমার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে, কেউ কেউ মোহনবাগানকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের পরের শক্তি হিসাবে ধরেছিলেন। তবু আমি সফল হয়েছি। ঈশ্বর আমাকে সহায়তা করেছেন।

মাঠের মধ্যে ৭০ মিনিট ধরে তাকে টানা কথা বলতে দেখেছি কখনো রসিকতা করে, কখনো সিরিয়াস ভঙ্গিতে। এখনো তিনি বলে চলেছেন একই ভঙ্গিতে—আমার ছেলেরা ভাল খেলেছে, ওরাই সম্মান এনে দিল। বিদেশ আজ ভালো খেলেছে। অধিনায়ক দিলীপ সমেত সব প্লেয়ারকে অভিনন্দন জানাই। এমন কি যারা মাঠে নামেনি, তাদেরও। দিলীপ পুরোপুরি ফিট, তবে ওকে টিমে রাখিনি দলের কথা ভেবেই।

ছটফটে ও সদাহাস্যময় যুবক **মানস** ভীষণ খুশী। ঘরে যেতেই ও হাতে হাত ডুবিয়ে দিল। ২৩টি গোলই শুধু মানস দেয়নি,



খেলাশেষে তাঁবুতে মানস—গৌতম/শঙ্কর

দলের লিগ জয়ের পথে বিশেষ অবদানও রেখে গেছে। সুব্রত এমন সময় ঘরে ঢুকে বলল—এই ধারা বজায় রাখতে পারলে সুরজিতের চেয়েও মানস বেটার উইঙ্গার হবে। আক্রমণভাগের তিনজন প্লেয়ার দল ছেড়ে যাওয়ায় মানস আর বিদেশের ওপর এবার অনেক বেশী দায়িত্ব পড়েছিল। মানস সে দায়িত্ব পালন করেছে।

সবুজ মেরুন জার্সি পরে একদিনও মাঠে না নামলেও কেষ্ট মিত্র (সুধীর কর্মকারও এবার একটিও ম্যাচ খেলেনি, এবং সে এদিনও মাঠে আসেনি) তার দলের লিগ জয়ে সবিশেষ আনন্দিত। ও বলল—দেখুন, ছোটবেলা থেকেই আমি মোহনবাগান-ভক্ত। আমার সম্পর্কে কারোর কারোর ধারণা ছিল—আমি খুব আন-লাকি। যে টিমে যাই, সে টিম নাকি চ্যাম্পিয়ন হয় না, আজ সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হল।

প্লেয়ার্স রুমে ঢুকে একটি চেয়ারে **গৌতম** তখন সবে ক্লান্ত দেহটা এলিয়েছে। এবারের লিগে গৌতম অসাধারণ খেলেছে। টিমটাকে প্রধানত টেনেছে সে-ই, মানসকে অক্লান্তভাবে বল জুগিয়ে গেছে সে! ওকে অনুরোধ করলাম কিছু বলতে। নিজের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত না হয়ে বলল—সকলেই ভাল খেলেছে। এটা আমাদের সমবেত জয়। আমি খুশী।

প্লেয়ার্স রুমে একটা আনন্দের পরিবেশ। সকলের চোখে মুখেই খুশীর হাওয়া। কিছু জিজ্ঞেস করার খুব ইচ্ছে ছিল প্রতাপ ঘোষকে। খুঁজে পেলাম না তাকে। আগেই সে চলে গেছে। প্রথম বড় টিমে এসেই দলের লিগ জয়ের পথে সে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। সকলেই কিছু না কিছু বলেছে। শুধু একজনই কিছু বলতে বলার অনুরোধটা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন—শৈলেন মান্না।

প্লেয়ার্স রুমে বসে আছি। কম্পটন, শ্যাম, শ্যামলরা জামা-প্যান্ট পরছে। হাসি ঠাট্টাও হচ্ছে। একজনের চোখে মুখে কিন্তু দারুণ অবাক ও বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল—**জেভিয়ার প্যায়াসের**। লিগ জেতার পর এমন আনন্দ হতে পারে, এটা তার ধারণাতেই ছিল না। তাই একটু শেকি হয়ে যাচ্ছিল সে। পি কে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখছো তো। জিতলে তুমি এখানে রাজা। আর হারলে—

প্রদীপ ব্যানার্জি পরের দিন সব প্লেয়ারকে তার বাড়িতে দুপুরে খেতে নেমন্তন্ন করেছেন। প্রসূন, গৌতম প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বলছেন। প্রসূন বলল—আমাদের এই জয় দাদারও জয়। দাদা আমাদের পিছনে যেভাবে থেকেছেন, সেকথা নতুন করে আর কি বলব!

সাতটা বেজে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। মাঝখানে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তবু প্লেয়ার্স রুম থেকে তখনো পটকার শব্দ আর উল্লাস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্লেয়াররা একে একে টেন্ট ছাড়ছে। আমিও উঠলাম, সওয়া সাতটা নাগাদ। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তখনো কিছু জনতা দাঁড়িয়ে আছে প্রিয় খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ভাসিয়ে দেবার জন্য।



খেলাশেষে তাঁবুতে, শ্যাম থাপা ও তপন দাস/অরুণ মুখার্জি

কোচ হিসাবে অমল দত্ত আবার প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনঃ চুনী গোস্বামী

[মরশুমের মাঝখানে বড় দলের কোচ পরিবর্তনের ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তাটুকুকেই বড় করে তুললেও সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক এই নিবন্ধে চুনী গোস্বামী বলেছেন মহমেডানের কোচ হওয়া অমল দত্ত'কে অবশ্যই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।]

মরশুমের মাঝখানে কোচ পরিবর্তনের ঘটনা সচরাচর ঘটে না, বিশেষ করে বড় দলের। অন্তরালের ঘটনাবলী যাই হোক—তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তবে মহমেডান স্পোর্টিং-এর কোচের পদে রহমানের জায়গায় অমল দত্ত আসায় এটা নিশ্চয় করে বলা যায়—ব্যাপারটা তাকে কোচ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে বসে যে কথাটা আমার সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে—তাহোল, যে পরিস্থিতিতে অমল দত্ত দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তা খুব সহজ ছিল না। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা দুটিই বাকি তখন। ওই দুটি ম্যাচে অতঃপর মহমেডানের ভূমিকার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অমল দত্তের প্রশংসা করতেই হবে। যে ভাবে শুরু করে এগোচ্ছিল মহমেডান স্পোর্টিং দল, তা দিয়ে ভাবা যায়নি মোহনবাগান অথবা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের ম্যাচের ফল এই ধাঁচের হবে। প্রত্যাশিত পথ ছেড়ে মহমেডানের এই হঠাৎ করে সরে আসা যেমন কাকতালীয় কিছু নয়, তেমনি তাতে কোচের ভূমিকাও খুব ছোট নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, রহমান কখনোই কোচিং ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াসলি নেননি। প্র্যাকটিক্যাল দিকে এককালের খেলোয়াড় হিসেবে তার কিছু অভিজ্ঞতা হয়ত ছিল, সে তুলনায় থিওরিটিক্যাল কিছুই নয়। টুকরো-টাকরা খবরাখবরে কান পাতলে তার 'ইরটিক বিহেভিয়ারের' কথাও এসে পড়বে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে কেউ যদি তাকে অর্থডক্স ফুটবলার বলতে না চান তাতেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না বোধহয়।

সালামের কথা আজ মনে পড়ছে আমার। রহমানের জায়গায় তিনি থাকলে মহমেডান হয়ত লাভবান হত। শুধু ফুটবলারের পরিচিতিই নয়, সালাম এন আই এস কোচও। তারচেয়ে বড় কথা তার অভিজ্ঞতাও এক সম্পদ। তবে অমল দত্তকে পাওয়াই বা কম



কিসে? এই দশকে কলকাতার বড় দলের ফুটবল কোচদের কথা। ভাবলে যে তিনজনের কথা এসে পড়বে অমল দত্ত তাদেরই একজন।

প্রদীপ ব্যানার্জি, অমল দত্ত বা অরুণ ঘোষ—কে ভাল, আর কে বড়, তার তুলনা করার ধৃষ্টতা দেখাতে বলেন যদি কেউ—তবে আমি রাজী নই। তবে একথা মানতে ও বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রদীপ ব্যানার্জিকে সাফল্যের মানদণ্ডে বড় বলতেই হবে। অবশ্য তাই বলে এই নয় যে, অমল দত্ত'র কোচিং সাফল্যের পথে যায়নি। ফুটবলারের ব্যাকগ্রাউণ্ড হাতড়াতে গেলে তাকে হয়ত অন্যদের পাশাপাশি দেখা যাবে না। তবে তার অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি, পদ্ধতিগত স্ট্র্যাটেজি সবই সাফল্যের সোপান বিশেষ, তাতে আর সন্দেহ কোথায়।

একটা কথা অনস্বীকার্য—কোচ মাত্রেই নেতা, ইংরাজী প্রতিশব্দে লিডার। অমল দত্ত'ও তাই। স্বভাবতই রহমানের কাছে যা পাওয়া যায়নি অমল দত্তের কাছে তাই পাচ্ছে মহমেডান। মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গল, দু'দলেরই কোচ হয়েছিলেন তিনি। কয়েকটি বছর ছোট ক্লাবের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখলেও এটা ভোলা যায় না যে পেশাদার হিসেবে তার অভিজ্ঞতা যা আছে তা মূল্যবান। তা থেকেই সৃষ্ট আত্মবিশ্বাস আর প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনেও প্রখর চিন্তাশক্তি তাকে মহমেডানের কোচ হবার প্রেরণা এনে দিয়েছে।

কথায় বলে উত্থান আর পতনই জীবন। এতবড় সত্যি সম্ভবত আর নেই। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই উত্থান আর পতন আসে, ...এবং একজন কোচের জীবনেও। সব কোচকেই তার মুখোমুখি হতে হয়। অবশ্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সব সময় এমনিতেই গড়ে ওঠে না। অন্যান্য কিছু ব্যাপারও আছে যা পরিস্থিতির 'হাল' হয়ে ওঠে। ব্যক্তি-সত্তার সেই অবদমিত চেহারাই যে শেষ কথা নয় আজ আবারও তা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।

এত কথা বলে স্বভাবতই সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে যাব আবার। যে পরিস্থিতিতে মহমেডানের প্রশিক্ষণের ভার তুলে নিয়েছেন অমল দত্ত এবং তার পরবর্তী লক্ষণগুলি একটিই দিক-নির্দেশ করছে এখন। মহমেডানের কোচ হবার পর তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়।

[সাক্ষাৎকার নরেন চট্টোপাধ্যায়।]



এবারের সেরা শারদীয়া সংখ্যা
খেলার আসর

কলকাতার ফুটবল নিয়ে দারুণ অঙ্ক কষেছেন চুনী গোস্বামী। ● ওলিম্পিক আমাদের কি দিয়েছে—দুষ্প্রাপ্য ছবিসহ নানা অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন অতুল মুখার্জি। ● রিপোর্টারদের ঝুঁকি আজকাল প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে, কিন্তু কি ধরনের? চিরঞ্জীব-এর একদম নতুন ধরনের রচনা—খবর সংগ্রহে নানা ঝুঁকি। ● পর্বতারোহণ সম্পর্কে লিখেছেন ধ্রুব মজুমদার। ● জানেন—কলকাতার একটি পরিবার কয়েক দশক ধরে চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুদের জন্ম দিয়েছে। কোন পরিবার? ওদের ঘিরে ভুবনেশ্বর পাণ্ডের অসাধারণ রচনা। ● এই দুজন মহিলা-খেলোয়াড় নন, কিন্তু দিনের পর দিন ভীষণ টেনশনে ভোগেন। বড় দলের খেলা থাকলে খাওয়া ঘুম ভুলে যান। কারা ওই দুজন। কেমন টেনশনে থাকেন? হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন অন্তরঙ্গভাবে ওদের কথা। ● ইস্টবেঙ্গল শুধু নয়, এদেশের ফুটবলের প্রাণ-পুরুষ জে সি গুহ বলেছেন,—ফুটবলের শোচনীয় হাল কেন? পবিত্র দাসের রচনা ওই নিয়ে। ● বাংলায় ব্যাডমিণ্টনের কিংবদন্তী 'মামাবাবু'। কি করে গেছেন তিনি এবং কিভাবে—লিখেছেন বিপ্লব তালুকদার। কম্পিউটারে দাবা সম্পর্কে হিমানীশ গোস্বামী। ● আসামে নাকি কোনো খেলায় পুরুষরা তেমন সফল নয়, যা করেছে মেয়েরা—লিখেছেন লক্ষ্মণ পোদ্দার। ● জামশেদপুরের খেলাধূলায় বাঙালীদের অবদান সম্পর্কে অমল ত্রিবেদী। ● কেমন ফুলব্যাক(হকি)সুরজিৎ সিং—মদন পাল শর্মার রচনা। ● প্রতিবন্ধীদের খেলাধূলা সম্পর্কে লিখেছেন শিশির ঘোষ।

২৪ বছর আগে অমিয় তরফদার প্রথমবার মস্কো গিয়েছিলেন। তখন সেখানে খেলাধূলার প্রচলন কেমন ছিল। রুশরা ভারতীয়দের কেমন আপ্যায়ন করেছিল? সঙ্গে তারই তোলা ছবি।

বক্সিং, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিক্স, কবাডি, ভলিবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন—নোভি কাপাডিয়া, শ্যামল শ্যাম, নারায়ণ ওঝা, সুব্রত সরকার, তরুণ বসু, শুক্লা মজুমদার, আলো রাহা, সুদেষ্ণা বড়ুয়া, সন্দীপ দত্ত আব্দুল তৌহিদ, তপন রায় এবং অনেকে

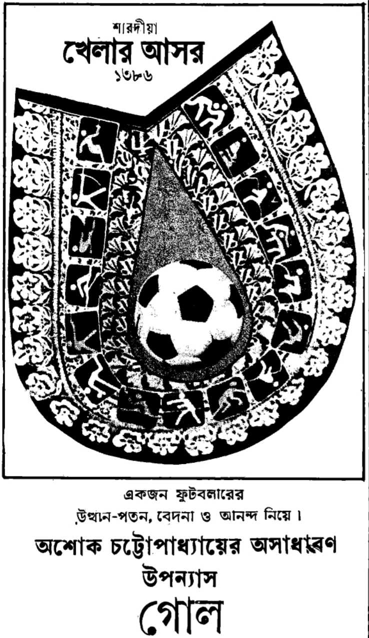
অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু আঢ্য প্রমুখের ছড়া।

ছবি তুলেছেন : অমিয় তরফদার, সমর তরফদার, পাহাড়ী রায় চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শংকর নাগ দাস, হোসি মিস্ত্রী, রাজিব নায়ার, কমল জুলকা, ডি জে আনন্দরাজ প্রমুখ।

ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ, ধ্রুব রায় সন্তোষ গুপ্ত, অর্ধেন্দু রায়, অরুণ চ্যাটার্জি ও নির্মল সাহা।

কার্টুন : লাহিড়ী, আলি, রাজা ও পি জি।

আপনার প্রিয় তারকাদের ২০টিরও বেশি রঙীন ছবি। সাদা কালোয় চোখ ধাঁধানো ছবির অ্যালবাম আট পৃষ্ঠা জুড়ে।



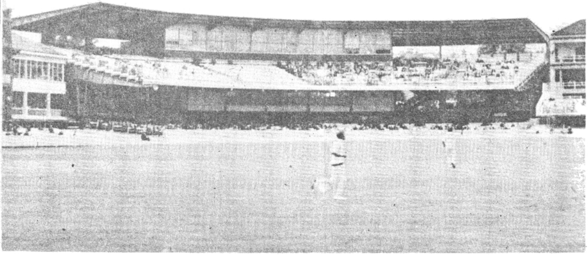
একজন ফুটবলারের উত্থান-পতন, বেদনা ও আনন্দ নিয়ে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস
গোল

২০০-রও বেশি পৃষ্ঠা। দাম আট টাকা। আজই স্টলে বা কাগজের হকারকে বলে রাখুন।

ইডেনের ক্রিকেট দর্শকরা লর্ডসে গেলে হতাশ হবেন





লর্ডস মাঠ, উপরে প্রেস বক্স

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে সুব্রত সরকার

'লর্ডসে টেস্ট ম্যাচ দেখা এক দারুণ অভিজ্ঞতা, না ?'

গত সপ্তাহে কলকাতায় ফেরবার পর ক্রিকেটের আলোচনা হলেই অনেকে আমায় এই রকমের প্রশ্ন করেছেন। ক্রিকেটের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যারাই একটু সচেতন, তারা শুনে এসেছেন লর্ডসই ক্রিকেটের 'মক্কা'। তাদের ধারণা, লর্ডসের মতন সুন্দর ক্রিকেট মাঠ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

দু-বছর আগে লর্ডসে প্রথম খেলা দেখেছিলাম অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ডের জুবিলী টেস্ট। সেবার বসেছিলাম দর্শক-আসনে, আর এবারকার দ্বিতীয় টেস্ট দেখলাম প্রেসবক্স থেকে। লর্ডসের 'মিডিয়া গ্যালারি' একটি বিরাট কাঁচের বাক্সের মত। এটি হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত লর্ডস প্যাভিলিয়নের বাঁদিকে ওয়ার্নার স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকটায়। একধারে রেডিও বক্স, অন্যপাশে টেলিভিসন বক্স আর মাঝখানে প্রেস বক্স। সেখানে আসন সংখ্যা ১১০। তবে আমাদের ইডেন গার্ডেনসের মত প্রত্যেকের জন্য মাত্র ১৬ ইঞ্চি জায়গা নয়। চব্বিশ ইঞ্চি করে বসবার জায়গা, আর সামনের টেবলে টাইপরাইটার, কাগজপত্র থেকে লাট-বক্স প্রভৃতি রাখবার যথেষ্ট জায়গা।

কিন্তু ওই কাঁচের বাক্সের মধ্যে বসে খেলার মাঠের আবহাওয়া থেকে নিজেকে কেমন দূরে মনে হত। বিশেষ করে যখন একটু ঠাণ্ডা ভাব, তখন প্রেস বক্সের সব কাঁচের জানালা নামানো থাকলে বাইরের কোন শব্দই শোনা যায় না। যারা ভারতের প্রধান টেস্ট কেন্দ্রগুলিতে খেলা দেখেছেন, বিশেষ করে কলকাতার মত প্রকাণ্ড স্টেডিয়ামে, তাদের লর্ডসের আবহাওয়াটা বেশ সংযত মনে হতে পারে। তাছাড়া ইডেনের প্রেস বক্স যেমন একেবারে উইকেটের লাইনে, লর্ডসে তেমন নয়। প্যাভিলিয়নটি পিচের লাইনে।

তবে লর্ডসের একটা জিনিস আমাদের অনেককেই অবাক করেছে। সেখানকার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় দিনে যখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হল, সারা মাঠ প্রায় ভেসে গেল। কিছুটা বর্ষার সময়ে ইডেনের মত দেখাচ্ছিল। এক পাশের বাউণ্ডারির কাছে এমন জল জমেছে, একজন দর্শক তো জামা-কাপড় খুলে ফেলে জাঙ্গিয়া পরে ডাইভ দিয়েই সেখানে নেমে পড়লেন—যদি সাঁতার কাটা যায়।

এমন অবস্থায় তো কলকাতার মাঠে দু-চার দিন খেলা হতে পারে না, কিন্তু লর্ডসে পরের দিন লাঞ্চের আগেই খেলা হল। লর্ডস মাঠের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৪-তে যে নতুন ড্রেন বসানো হয়েছিল, তা খুবই নিখুঁত। পিচ ঢাকা হয় চাকার উপর বসানো পলি-প্লাস্টিক কভার দিয়ে। এগুলিকে ট্র্যাক্টর দিয়ে নার্সারি এণ্ডের বাউণ্ডারির দিক থেকে আনা হয়। পিচের দুই ধার আর দু-দিকের বোলারদের রান-আপ ঢাকা হয় ত্রিপল ধরনের কৃত্রিম ঢাকনা দিয়ে। তাছাড়া পিচের চারপাশে জল টেনে নেওয়ার পাইপ লাগানো হয়, যদিবা একটু জল পিচের উপর এসে পড়ার মত হয়—সেটি সঙ্গে সঙ্গে পাম্পের সাহায্যে আউটফিল্ডে ফেলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিনের বৃষ্টির পর শনিবার যখন খেলা আরম্ভ হল, তখন আমরা কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিক যেখানে বসে আছি—সেখানে এসে 'ডেইলি এক্সপ্রেস'-এর প্রাক্তন ক্রিকেট-লেখক এবং বর্তমানে কর্ণহিল ইনস্যুরেন্স গ্রুপের পি আর ও ক্রফোর্ড ওয়াইট বললেন, 'এত বৃষ্টি, কিন্তু পিচে বিন্দুমাত্র জল আসেনি। আশ্চর্য ব্যাপার না?' ভদ্রলোক একটু গর্ব করেই কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু 'হিন্দু' সংবাদপত্রের রাজন বালা সুযোগ পেয়েই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের এখন ডেরেক আণ্ডারউডের মত বোলার নেই তো! থাকলে দেখা যেত উইকেটের এক ধারে একটু জল ঢুকেছে।' ওয়াইট কিছুটা রেগে গিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'ইউ উইল হ্যাভ টু গো।' রাজন মুচকি হেসে আমাদের বলল, 'আমি কি করব, ওই তো বোকার মত প্রসঙ্গটা তুলল!'

প্রেস বক্সের এক ধারে রাজনের কাছাকাছি আমি ছাড়া বসতো 'ইণ্ডিয়া উইকলির' মানব মজুমদার, বহু বছর লণ্ডনে থাকা সত্ত্বেও যে মনেপ্রাণে কলকাতার লোক। কিছুটা দূরে 'স্পোর্টস উইক'-এর মিহির বসু—ইংরেজ সাংবাদিকরা তো তাকে 'মা-হাইর' বলে ডাকত। অন্যদিকের সিটে ইউ এন আই-এর সাংবাদদাতা মনোযোগ দিয়ে এক আঙুলে টাইপ করে যেতেন। এডিটর-সাহেব মনসুর আলি প্রথম দিনটা অনেকক্ষণ সামনের সিটে বসে থাকার পর আমাদের কাছে চলে এলেন। বাকি চারদিনে তাকে প্রেস বক্সে খুব কমই দেখা গেছে।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রেস বক্সে আরও ছিলেন তিনজন মারাঠি—বম্বে থেকে দু'জন, অন্যজন পুনের। প্রথম দিন ভারত ৯৬ অল আউট হওয়াতে ইংরেজ সাংবাদিকরা অনেকেই ভারতীয়দের একটু সদয় ভাব দেখাচ্ছিলেন। আমাদেরও মন-মেজাজ খারাপ। এর মধ্যে

হঠাৎ মানব মজুমদার হিন্দীতে বলে উঠলেন, 'আমার পাশের সাদাটা অন্তত এক মাস স্নান করেনি।' কথাগুলি আমরা যারাই শুনতে পেলাম, সবাই হো-হো করে হেসে উঠতে বাধ্য হয়েছিলাম। ইংরেজরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ৯৬-এ অল আউট হয়েও এদের এত হাসি কিসের!

প্রেসবক্সের পিছনের দিকের দুটি কোণে দুটি টেলিভিসন-সেট। নির্বাক টি ভি, তবে মাঠের খেলা সেখানে পরিষ্কার দেখা যায়। ক্যাচ বা এল-বি-ডবলিউ অ্যাপিল বা অন কোনও ঘটনা হলে সেটি আবার স্লো-মোশনে রি-প্লে করে দেখান হয়। তখন তো সবাই টি ভি-র দিকে তাকিয়ে। আমার ঠিক ডান কাঁধের উপরেই একটি টি ভি ছিল, তাই আমার কিছুটা অস্বস্তি (?) হত।

টি ভি রি-প্লে থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল ঘাউড়ির বলে ডেভিড গোয়ার শূন্য রানেই এল-বি-ডবলিউ হয়েছিলেন। ঘটনাটি টি ভি-তে দু'বার দেখাবার পর একজন ইংরেজ সাংবাদিক মন্তব্য করলেন, 'ইট উড হ্যাভ মিস্‌ড দ্য লেগ স্টাম্প।' তাতে পুনের সাংবাদিক বাল পণ্ডিত উত্তর দিলেন, 'বাট ইট উড হ্যাভ হিট দ্য মিডল্ স্টাম্প!' রাজন টি ভি স্ক্রিনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। এবার বলল, 'লক্ষ্য করলে, আম্পায়ার পকেট থেকে হাত বার করেও আবার ঢুকিয়ে নিল!' আর মানব মজুমদার খালি বলে যেতে লাগল, 'ডিকি বার্ড ইজ এ গুড আম্পায়ার!'

এমন ভাবে টি ভি-র উপর নির্ভর করার অসুবিধা আছে বৈকি। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে গাভাসকর যখন চার বলে তিনটি চান্স দিয়ে শেষবারে ব্রিয়ারলির হাতে কট আউট হয়ে বথামের শততম টেস্ট ভিক্টিম হল, তখন প্রেস বক্সের দুটি টি ভি-ই বিকল ছিল। সবাই মিলে এই ঠিক করল, ব্রিয়ারলি ডান দিকে ডাইভ দিয়ে এক হাতে ক্যাচটি নিয়েছেন। কিন্তু কিছু পরে যখন অনেক কষ্টে আবার টি ভি সেটগুলি চালু করা গেল, রি-প্লেতে দেখা গেল ব্রিয়ারলি বাঁদিকে নিচু হয়ে দুই হাতে বলটি লুফেছিলেন।

রি-প্লের সময় সবাই টি ভি-র দিকে তাকিয়ে, তিন-চারজন ইংরেজ লেখক তো আসল খেলার মাঠের দিকে দেখছিলেনই না। মাঠের দিকে পিছন করে টি ভি-র উপর এক চোখ রেখে গপ্প চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টি নামতে পারে মনে হলেই চারপাশে তাস বেরিয়ে পড়ত। আবার লাঞ্চের পর দু'তিনটে আপেল নিয়ে ক্যাচ-ক্যাচ খেলাও হত।

অন্যদিকের টি ভি-র সামনে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে নোট লিখে যেতেন। মাথায় টাক, আর গালে লম্বা সাদা দাড়ি। একদিন রাজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কে?' রাজন বলল, 'ডবলিউ জি গ্রেস!' পরে আলাপ করে জানলাম ভদ্রলোক হল্যাণ্ডের এক সংবাদ-পত্রের হয়ে রিপোর্ট করছেন। প্রেস বক্সে একজন আমেরিকানও ছিলেন—ডাডলি ডাউস্ট, যিনি মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে দুটি বই লিখেছেন।

প্রেস বক্সের সামনের রো'র ঠিক মাঝখানে বসতেন একজন বেঁটে, মোটা-মতন ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি 'উইসডেন' বর্ষ পঞ্জিকার সম্পাদক নর্মান প্রেস্টন। এখন বয়স ৭৬। প্রেস বক্সে কেউ তাকে নাম ধরে বা মিঃ প্রেস্টন বলে না। সবার কাছেই তিনি 'মিস্টার এডিটার।'

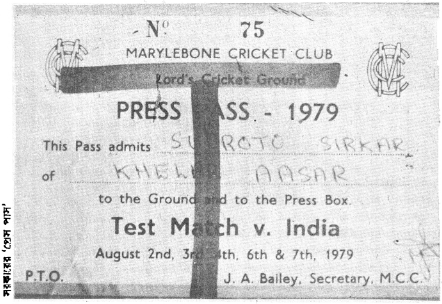
একদিন দুই বয়স্ক ইংরেজ সাংবাদিকের মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া, চেঁচামেচি। শেষ হল 'শাট আপ' তার 'ইউ শাট আপ' দিয়ে। পরে জানা গেল একজন বুঝি কর্নহিলের দেওয়া অনাজনের তিনটি বল-পয়েণ্ট পেনই এক এক করে নিজের বলে সরিয়ে নিচ্ছিলেন।

প্রেস বক্সের ভিতরে বা প্রেস বক্স থেকে নাকি ছবি তোলা মানা, তাই একটি 'ক্লিক' শুনলেই বৃদ্ধ অ্যাটেণ্ডাণ্ট হাঁই-মাই করে দৌড়ে আসে। প্রেস-বারে অতিথি আনা যায়, তবে প্রেস বক্সে বাইরের লোকের ঢোকা নিষেধ। সারা শনিবার ডেনিস কম্পটনের জন্য ফোন আসছিল, তিনি বুঝি অনেককে প্রেস বক্সের নীচে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

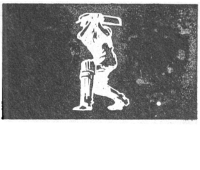
মাঝে মধ্যে কথা হচ্ছিল, তৃতীয় টেস্টের বিরতি দিবসে ভারতীয় জার্নালিস্টদের সঙ্গে ইংরেজ ক্রিকেট-রাইটারদের ক্রিকেট খেলা হবে। তবে টিমে টেস্ট প্লেয়ার নেওয়া চলবে না। তাই এদিকে যেমন মনসুর আলিকে বাদ দিতে হয়, অন্যদিকে দেখা গেল প্রায় সম্পূর্ণ একাদশই বাতিল: লেন হাটন (দ্য অবজার্ভার), কলিন কাউড্রে (সানডে টেলিগ্রাফ), টেড ডেক্সটার (সানডে মিরর) ডেনিস কম্পটন (সানডে এক্সপ্রেস), মাইক স্মিথ (বি বি সি টি ভি), ট্রেভর বেইলি (ফিনান্সিয়াল টাইমস) টোনি লুইস (সানডে টেলিগ্রাফ), জিম লেকার (ডেইলি মিরর), ফ্রেডি ট্রুম্যান (সানডে পিপল) প্রমুখ। তাছাড়া বেটিং-সংস্থা ল্যাডব্রোকের উপদেষ্টা হিসাবে প্রাক্তন উইকেটরক্ষক গডফ্রে ইভান্স বাজির হিসাব দিতে প্রায়ই প্রেস বক্সে আসতেন।

তবে এই সব প্রাক্তন টেস্ট তারকার মধ্যে একজন এখনও তার 'স্টার অ্যাপিল' বজায় রেখেছেন। রিচি বেনোর বয়স এখন ৪৮, সব চুল সাদা, পাটে পাটে সাজানো; সাজ-পোশাক, চাল-চলনের দিক থেকে তিনি সবচেয়ে 'স্মার্ট'। কেরি প্যাকার যখন তার ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট আরম্ভ করেন, তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন রিচি বেনো। আবার লর্ডসের মত ট্র্যাডিশনাল ক্রিকেটের আখড়ায় বি-বি-সি টি-ভি'র এক নম্বর কমেণ্টেটারও রিচি বেনো।

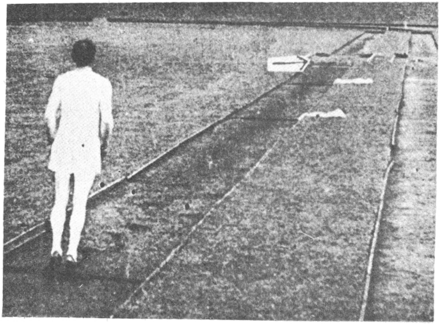
কিন্তু লর্ডসে ক্রিকেট দেখাটা কি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা? না—ছোট মাঠ, আসন সংখ্যা ৩৫ হাজার হলেও কোনদিন ২০ হাজারও লোক হয়নি। যারা দর্শক ঠাসা ইডেন গার্ডেনসে টেস্ট খেলা দেখেছেন, তারা লর্ডসে টেস্ট ম্যাচ দেখে কিছুটা হতাশ ও উত্তেজনার অভাব বোধ করতে পারেন।



লর্ডসে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে খেলার আসরের প্রতিনিধি সুব্রত সরকারের 'প্রেস পাস'



কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (১০)



স্বরাজ ঘোষ ঃ গত দুই সংখ্যায় যে ধরনের শারীরিক ব্যায়ামগুলো তুলে ধরেছি, তা সর্বাঙ্গীণ ফুটবলের জন্য সম্পূর্ণ নয়। ওই সমস্ত ব্যায়াম শরীরকে পুষ্ট করে মোটামুটিভাবে খেলার উপযোগী শরীর করে তোলে। তবে ফুটবল হল আসুরিক খেলা। এই খেলায় যেমন শক্তি, সামর্থ্য, দম, গতি, শরীরের কমনীয়তা দরকার, তার সঙ্গে আরও দরকার মস্তিষ্কের খেলা। অর্থাৎ দেহ ও মগজের খেলা। এই সমস্ত উপাদান বলকে কেন্দ্র করেই। সেই বলকে ওই উপাদানগুলোর সঙ্গে নিশ্চল ও সচল অবস্থায় সংযোজন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আগেই লিখেছি, অ্যাথলেটিক্সের দৌড় আর ফুটবলের দৌড় এক নয়। বিশুদ্ধ অ্যাথলিট আর ফুটবল খেলোয়াড় সম্পূর্ণ আলাদা। অ্যাথলিটের নজর হল শেষ সীমানায় তড়িৎ গতিতে একমুখী দৌড়ে পৌছান। আর ফুট-বল খেলোয়াড়ের নজর বহুমুখী, বিভিন্ন গতির সঙ্গে বলের সংযোজনে বলকে লক্ষ্যস্থানে পৌছান। ইংরেজিতে এই বলকে বলে 'মাস' বা গোলাকার জড়পিণ্ড। এই জড়পিণ্ডের সঙ্গে শরীর ও গতির নিখুঁত সংমিশ্রণ করাই হল ফুটবল খেলোয়াড়ের প্রধান কাজ। এই গোলাকার জড়পিণ্ডকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌছানোর উদ্দেশ্যে মাঝখানে কতকগুলো ভূমিকার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কতকগুলো বাধার সৃষ্টি হয়। সেগুলো অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থানে পৌছবার কার্যক্রমকে বলে খেলা। এই খেলার জন্য দরকার সুটিং, পাসিং, থ্রো, হেডিং, বল কন্ট্রোল ও গোলকিপিং ইত্যাদি। তাই এই অলঙ্কারগুলোয় দক্ষ হওয়ার জন্য আলাদা আলাদা শারীরিক ব্যায়ামও আছে। সেই ব্যায়ামগুলো লেখার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে তাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়ত এই লেখা শেষ হতে বহুদিন লাগবে। আগেই লিখেছি খেলার পুঁথি পড়ে সর্বাঙ্গীণ খেলোয়াড় হওয়া যায় না। প্রকৃত গুরু ধরতেই হবে। তবে একটা মোটামুটি নির্দেশনামা দিতে পারব লেখায়। আর পারব লেখা অনুযায়ী গুরুর সন্ধান করতে।

আগামী কয়েকটি সংখ্যায় ফুটবলের প্রয়োজনে ছবি দিয়ে কয়েকটি অ্যাথলেটিক্স বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই সংখ্যায় লিখছি ব্রড জাম্প নিয়ে। পড়লেই কতকগুলো প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। আর বুঝবে, আজকের দিনে খেলোয়াড়দের গোল মিস্ হওয়ার কারণ কি।

ফুটবলের প্রয়োজনে ব্রডজাম্পের মূল লক্ষ্য —লাফের দূরত্ব নয়। মূল লক্ষ্য হল, জাম্পের সাদা বোর্ড বা টেক অফ চিহ্ন। যে চিহ্ন থেকে জাম্প করতে হলে দিনের পর দিন অনু-মান করে 'রানওয়ে' বা দৌড় পথে দৌড়তে হয় ও সঠিক চিহ্নে লাফের পা-কে স্পর্শ করাতে হয়। এই অভ্যাস করতে প্রথমে পা মেপে অল্প গতির উপর দৌড়তে হয়। তারপর গতি বাড়াতে হয়। বিশুদ্ধ অ্যাথলেটিক্সে জাম্প করার সময় বোর্ড বা লম্ফ চিহ্ন স্পর্শ করতে না পারলে জাম্প কৃতকার্য হয় না। অর্থাৎ হিসাব মত দূরত্বে পৌছান যায় না। ব্রড-জাম্পের সময় দুটি ভূমিকা থাকে। প্রথম ভূমিকা হল, চূড়ান্ত গতিতে দৌড়ে জাম্পিং পা টেক অফ চিহ্ন বা লম্ফ চিহ্নকে স্পর্শ করে দেহের চূড়ান্ত ওজন দিয়ে স্প্রিং-এর মত করে জাম্পিং পা-কে পুস বা ঠেলা দিয়ে একটু উঁচুতে লাফ। দ্বিতীয় কাজটি হল, মাটিতে ল্যাণ্ড করার পূর্ব মুহূর্তে পা-কে সাইক্লিং করে ছুঁড়ে দিয়ে শরীরকে টেনে নিয়ে দুই পা-কে এক সঙ্গে মাটিতে ল্যাণ্ড করা। কিন্তু ফুটবলের জন্য ব্রডজাম্প হল বিভিন্ন গতিতে দৌড়ে নন কিকিং পা দিয়ে জাম্প চিহ্নকে স্পর্শ করে লাফ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিকিং পা-কে সাইকিং করে কিক-এর মত করে ছুঁড়ে দিয়ে ল্যাণ্ড করা। এর ফলে কল্পনামত নির্দিষ্ট স্থানে পৌছবার উপলব্ধি শক্তি জন্মায়। ফুটবল খেলোয়াড়দের পক্ষে সবচেয়ে প্রধান 'কনসেপসন', 'এইম' অর্থাৎ কল্পনামত অনুমান শক্তি। এই কথার কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নেই। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। যার যত দর্শনভাব, তারই 'কনসেপসন' বোধ বেশী। এটা পুঁথিগত লেখাপড়া থেকে জন্মায় না। এটা বেশীর ভাগ আসে অভ্যাস, অনুশীলন অর্থাৎ সাধনা থেকে। আবার বেশীর ভাগ থাকে জন্মগত। এই প্রসঙ্গে বিশ্বের ফুটবল দরবারে তাকিয়ে দেখ, যেমন স্ট্যানলি ম্যাথুজ, বিলি রাইট, বব চার্লটন, ববি মূর, ইয়াসিন, উয়েসিলার, জার্ডমুলার পেলে, পুসকাস, হিদে-কুটি, গ্যারিঞ্চা, ক্রইফ, বেকেনবাওয়ার, আল-বার্তো প্রমুখ খেলোয়াড়গণ—এরা কেউ উচ্চ-শিক্ষিত (পুঁথিগত) নন। কিন্তু 'কনসেপসনে' বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। এদিকে আমাদের দেশের যাদুকর সামাদ, সূর্য চক্রবর্তী, ছোনে, মজুমদার, রহমত, হাফিজ রসিদ, জোসেফ, আপ্পারাও, আমেদ খান, মোহিনী ব্যানার্জি, ল্যাংচা মিত্র, রমন, সঞ্জীব, ভরদ্বাজ, মেওয়ালাল, তাজ মহম্মদ, বলরাম, ইউসুফ খান প্রমুখ খেলোয়াড়গণ কেউ উচ্চ শিক্ষিত নন।

আবার এই ব্রডজাম্প অনুশীলনে এক সঙ্গে জন্মায় লক্ষ্যস্থল নিরূপন করার ক্ষমতা, গতি, শক্তি, তীব্রতা, ক্ষমতা ও এই উপাদান-গুলোর সঙ্গে 'মাস' বা জড়পিণ্ড অর্থাৎ বল-এর সংযোজন ক্ষমতা। তাহলে বুঝতে পার—ওই অবস্থায় বলকে সজোরে সট মারলে কি হয়? গোলকিপার কি চোখে বল দেখবে? কত কথাই তো তোমরা শুনছ—ইন সুইং ও আউট সুইং সট। কিন্তু এমন কতকগুলো সটের প্যাঁচ জন্মায়, যার সব মিলিয়ে হয়ে যায় ঘূর্ণির মত অর্থাৎ 'টরনেটো' সট। যা গোলকিপার হত-ভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে গোল খাবে। ক্রমাগত অনু-শীলনে এই ক্ষমতা জন্মায়। এই ধরনের সট আমাদের দেশেও আগে হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখনও হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে এখন এগুলো প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে,

কদাচিৎ দু-একটা জায়গায় দেখা যায়।

সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আজ এসব হচ্ছে না কেন? উদ্দেশ্যমূলক অনুশীলনের অভাবে। জানতে হয় কি কারণে হচ্ছে না বা কি করলে হয়। কেউ দেখেশুনে শেখে, আবার কেউ শিক্ষণ পদ্ধতিতে শেখে।

তোমরা বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড মেওয়ালালের নাম শুনেছ। তিনি আমার পাশে দশ বছর একনাগাড়ে খেলেছেন। তিনি ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন শুধু গোল করে। জীবনে তিনি কত চোখ জুড়ানো গোল যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তারই দেওয়া একমাত্র গোলে ভারত প্রথম এশিয়ান গেমসে ইরানকে হারায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ১৯৪৯ সালে লিগের খেলায় তার দেওয়া ৩৩টি গোল আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। কি করে তিনি এই ক্ষমতায় পৌঁছেছিলেন জান? অনুশীলনের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন গতির উপর বিভিন্ন ধরনের সেণ্টার ও পাসগুলোকে 'কানেক্ট' বা সংযোজন করে বিভিন্ন সটের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে গোল করতেন। ওই যে লিখলাম, কনসেপসনের কথা। দেখেছি তার কি কনসেপসন। যা বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানো যায় না।

যে ছবিটি এবার তুলে ধরলাম, তা'হল ব্রডজাম্প করার পূর্ব মুহূর্তে জাম্পার 'কনসেনট্রেট' বা সমস্ত মন অর্পণ করছে, যাতে দৌড়ের সঙ্গে 'টেক অফ চিহ্ন' স্পর্শ করে লাফ দিতে পারে। দূরে জাম্প পিট্ অর্থাৎ যেখানে লাফ দিয়ে পড়বে, তার ঠিক আগে তীর মার্ক। চিহ্ন 'টেক অফ চিহ্ন' নির্দেশ করছে।

(চলবে)

[ফুটবল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকলে 'খেলার আসর'-এর ঠিকানায় লেখককে চিঠি দিতে পারেন। —সম্পাদক]

চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন মনে রাখবেন দু'পৃষ্ঠায় লেখা চিঠি ছাপান সম্ভব নাও হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না, চিঠি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।

লিগে মোহনবাগানের ফল

মোহনবাগান—১ (পায়াস)	: ভ্রাতৃ সংঘ—০
মোহনবাগান—৩ (তপন-২, মানস)	: উয়াড়ি—০
মোহনবাগান—৫ (গৌতম, পায়াস, তপন ও মানস-২)	: কুমারটুলি—০
মোহনবাগান—৫ (মানস-২, পায়াস, তপন ও বিদেশ)	: বি এন আর—০
মোহনবাগান—২ (মানস ও তপন)	: পোর্ট ট্রাস্ট—০
মোহনবাগান—২ (মানস ও তপন)	: পুলিশ—০
মোহনবাগান—২ (পায়াস-২)	: জর্জ টেলিগ্রাফ—০
মোহনবাগান—৩ (মানস, সুব্রত ও শ্যাম থাপা)	: স্পোর্টিং ইউনিয়ন—০
মোহনবাগান—৫ (বিদেশ-২, প্রসূন, শ্যাম ও মানস)	: খিদিরপুর—১ (অমিত বাগচী)
মোহনবাগান—২ (পায়াস, রঞ্জিত)	: ইস্টার্ন রেল—০
মোহনবাগান—২ (মানস ও রঞ্জিত)	: টালিগঞ্জ অগ্রগামী—০
মোহনবাগান—১ (মানস)	: ইস্টবেঙ্গল—১ (সাব্বির)
মোহনবাগান—৩ (মানস, গৌতম ও পায়াস)	: কালিঘাট—০
মোহনবাগান—২ (মানস-২)	: সালকিয়া ফ্রেণ্ডস—০
মোহনবাগান—৩ (মানস, গৌতম, পায়াস)	: ক্যালঃ জিমখানা—০
মোহনবাগান—১ (শ্যাম থাপা)	: মহঃ স্পোর্টিং—০
মোহনবাগান—৬ (মানস-২, শ্যাম-২, পায়াস ও সুব্রত)	: কাস্টমস—০
মোহনবাগান—৩ (শ্যাম, মানস—২)	: হাওড়া ইউনিয়ন—১ (সুব্রত)
মোহনবাগান—৪ (মানস-৩, প্রসূন)	: রাজস্থান—০
মোহনবাগান—১ (মানস)	: রেলওয়ে এফ সি—০
মোহনবাগান—৩ (শ্যাম-২, মানস)	: এরিয়ান—১ (মতি সিং)



এত বুক ফুলিয়ে চলছে যখন নিশ্চয়ই মোহনবাগানের সাপোর্টার।

মোহনবাগানের কারও হ্যাটট্রিক হয়নি। মানস মোট গোল করেছে ২৩টি। তারপরেই স্থান পায়াসের। সে মোট ৯টি গোল করেছে। শ্যাম থাপা করেছে ৮টি গোল ও তপন দাস ৬টি। বিদেশ ও গৌতম দু'জনেই করেছে ৩টি করে গোল। ২টি করে গোল করেছে রঞ্জিত, সুব্রত ও প্রসূন।

মোহনবাগান দল এ মরশুমে গোল করেছে ৫৮টি। তাদের বিরুদ্ধে গোল হয়েছে ৪টি।

প্রশান্তর শুভেচ্ছা দিলীপকে

স্টাফ রিপোর্টার : ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি তার অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়েছে লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলকে। এক অনুষ্ঠানে দু'জনে দেখা হলে প্রশান্ত অধিনায়ক দিলীপ পালিতকে তার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে—'অন্য সকলকে আমার অভিনন্দন জানিও।' দিলীপ প্রশান্তকে ধন্যবাদ জানায়। এবং পরে তাকে চা-এ নিমন্ত্রণ করে। দু'জনে খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলে—কিন্তু খেলা নিয়ে কোন কথা হয়নি।

পরে প্রশান্ত জানায়—'আমার ইচ্ছে ছিল মাঠে গিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাব। কিন্তু পারিনি। কেন? সত্যি বলতে ঠিক সাহস হয়নি।'

'দিলীপ ক্যাপ্টেন হয়েও মাঠে নামতে পারল না—এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'দেখুন এ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। দিলীপ ওদিন খেলেছে কিনা এটা আমি বড় করে দেখিনি, ও মোহনবাগানের অধিনায়ক, আমরা দু'জনে বন্ধু, জয়ী অধিনায়ককে বন্ধু হিসাবে ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবারের দুই টপ স্কোরারের অন্যতম মনিসকেও। ও বেশ খেলেছে এই মরশুমে।'



ঘরোয়া পরিবেশে দুই অধিনায়ক দিলীপ ও প্রশান্ত / পাহাড়ী

লিগে ইস্টবেঙ্গলের ফল

ইস্টবেঙ্গল—২ : পুলিশ—০
(চিন্ময় ও মীর সাজ্জাদ)

ইস্টবেঙ্গল—১ : স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০
(ডেভিড উইলিয়ামস)

ইস্টবেঙ্গল—৪ : বি এন আর—০
(মীর সাজ্জাদ-৩, ডেভিড উইলিয়ামস-১)

ইস্টবেঙ্গল -২ : ইস্টার্ন রেল—০
(মীর সাজ্জাদ, সাব্বির আলি)

ইস্টবেঙ্গল—১ : টালিগঞ্জ অগ্রগামী-০
(সাব্বির আলি)

ইস্টবেঙ্গল—১ : রাজস্থান—০
(সাব্বির আলি)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : রেলঃ ফুটবল ক্লাব-১
(সাব্বির-৩, হ্যাটট্রিক) (কিশোর মুখার্জি)

ইস্টবেঙ্গল—২ : উয়াড়ি—০
(দেবরাজ ও সাব্বির)

ইস্টবেঙ্গল—১ : কালীঘাট—০
(সুরজিত)

ইস্টবেঙ্গল—৪ : এরিয়ান—১
(সাব্বির-২, কাজল চ্যাটার্জি ও সমীরণ সাহা-আত্মঘাতী) (দেবাশিস রায়)

ইস্টবেঙ্গল—৫ : কুমারটুলি—০
(মিহির-৩, হ্যাটট্রিক, সাব্বির ও সুভাষ)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : হাওড়া ইউনিয়ন-১
(মনজিত সিং ও ডেভিড-২) (সুব্রত চ্যাটার্জি)

ইস্টবেঙ্গল—১ : মোহনবাগান—১
(সাব্বির) (মানস)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : কাস্টমস—০
(সাব্বির-২ ও ডেভিড)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : খিদিরপুর—১
(ডেভিড, কাজল ও সুরজিত) (অমিত বাগচী)

ইস্টবেঙ্গল—৪ : পোর্ট ট্রাস্ট—০
(সাব্বির-২, ডেভিড ও কাজল চ্যাটার্জি)

ইস্টবেঙ্গল—৫ : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস—০
(সাব্বির-২, প্রশান্ত, দেবরাজ ও মনোরঞ্জন)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : ভ্রাতৃ সংঘ—০
(মিহির-২ ও ডেভিড)

ইস্টবেঙ্গল—০ : মহমেডান স্পোর্টিং-০

ইস্টবেঙ্গল—৪ : ক্যালঃ জিমখানা—১
(সাব্বির-৩ হ্যাটট্রিক ও মীর সাজ্জাদ) (গৌর ব্যানার্জি)

ইস্টবেঙ্গল—৩ : জর্জ টেলিগ্রাফ—৩
(সাব্বির-৩ হ্যাটট্রিক) (বিভাস সরকার ও বাদল ভট্টাচার্য-২)

ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলা হয়নি।

ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে কে ক'টা গোল দিয়েছে

সাব্বির আলি—তিনটি হ্যাটট্রিক সহ ২৩, ডেভিড উইলিয়ামস—৮, মীর সাজ্জাদ—৬, মিহির বসু—৫, (একটি হ্যাটট্রিক সহ), কাজল চ্যাটার্জি—৩, সুরজিত সেনগুপ্ত—২, দেবরাজ—২, এছাড়া সুভাষ ভৌমিক, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মনজিত সিং, প্রশান্ত ব্যানার্জি ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রত্যেকে পেয়েছে ১টি করে গোল।

ইস্টবেঙ্গল একটি আত্মঘাতী গোল পেয়েছে এরিয়ানের বিপক্ষে, গোল করে সমীরণ সাহা।

লিগে অন্যান্য দলের কারা ক'টা গোল পেয়েছে

দেবাশিস রায় (এরিয়ান)—৮, বিভাস সরকার (জর্জ টেলিগ্রাফ)—৮ (একটি হ্যাটট্রিক সহ), সোমনাথ ব্যানার্জি (খিদিরপুর)—৮, অমিত বাগচী (খিদিরপুর)—৭, বিশ্বজিত ভট্টাচার্য (এরিয়ান)—৬, কার্তিক শেঠ (রাজস্থান)—৬, উত্তম চক্রবর্তী (উয়াড়ি)—৫, প্রদীপ দত্ত (টালিগঞ্জ অগ্রগামী)—৫, শিবব্রত নাথ (সালকিয়া ফ্রেণ্ডস)—৫, কিশোর মুখার্জি (রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব)—৫, অরবিন্দ মুখার্জি (ইস্টার্ন রেল)—৫।

(৫টি গোল যারা পেয়েছে তাদের নাম দেওয়া হোল)

কলকাতা ফুটবল লীগ '৭৯

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান—	২১	২০	১	০	৫৮	৪	৪১
ইস্টবেঙ্গল—	২১	১৮	৩	০	৫৫	৯	৩৯
মহমেডান স্পোর্টিং—	২১	১৭	৩	১	২৭	৪	৩৭
এরিয়ান—	২১	১২	২	৭	২৩	১৫	২৬
খিদিরপুর—	২১	৯	৬	৬	২৩	২০	২৪
টালিগঞ্জ অগ্রগামী—	২১	৯	৬	৬	১৫	১৩	২৪
রাজস্থান—	২১	১০	৩	৮	১৫	১৫	২৩
ইস্টার্ন রেল—	২১	৭	৭	৭	১৬	১৩	২১
জর্জ টেলিগ্রাফ—	২১	৫	১০	৬	১৭	২১	২০
উয়াড়ি—	২১	৫	১০	৬	১২	১৩	২০
সালকিয়া ফ্রেণ্ডস্—	২১	৫	১০	৬	১৫	২২	২০
বি এন আর—	২১	৪	১০	৭	১০	১৯	১৮
কাস্টমস—	২১	৩	১১.	৭	৮	১৯	১৭
কালিঘাট—	২১	৫	৬	১০	১২	১৫	১৬
হাওড়া ইউনিয়ন—	২১	৪	৮	৯	১৩	২২	১৬
রেলওয়ে এফ সি—	২১	৪	৮	৯	১১	১৭	১৬
ক্যালকাটা জিমখানা—	২১	৩	১০	৮	১৪	২৩	১৬
স্পোর্টিং ইউনিয়ন—	২১	৩	১০	৮	৯	১৯	১৬
কুমারটুলি—	২১	৩	১০	৮	১০	২৩	১৬
ভ্রাতৃ সংঘ—	২১	৫	৫	১১	১২	২৮	১৫
পোর্ট ট্রাস্ট—	২১	৩	৭	১১	৯	২৯	১৩
পুলিশ—	২১	১	৮	১২	৯	২৭	১০

(ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে)

মেদিনীপুর জেলা টেবল টেনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চম বর্ষ মেদিনীপুর জেলা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হল ঝাড়গ্রাম দেবেন্দ্র মোহন হলে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এ কে দাস। জেলা টেবল টেনিসের পুরুষ সিঙ্গলস্-এ বিজয়ী হয়েছেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। পুরুষ ডাবলস্-এ চ্যাম্পিয়ন নরেশ দাস ও সুনীল দত্ত। বালক ও বালিকা বিভাগে যথাক্রমে সিঙ্গলস বিজয়ী রঞ্জন বসু ও সুরঞ্জনা নাগ। দলগত চ্যাম্পিয়ন তমলুক সুইমিং ক্লাব। ওপেন বিভাগে দীপক হালদার সিঙ্গলস্ ও ডাবলস্ খেতাব জয় করেন। ডাবলস্-এ দীপকের জুটি ছিলেন টমাস লী। দেবাশীষ সাহা ও তুষারকণা দে যথাক্রমে বালক ও বালিকা বিভাগে সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ন হয়।



দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন মির্জাপুর ইউনিয়ন

স্টাফ রিপোর্টার : ১৮টি ম্যাচের ১২টিতে জয় এবং ৬টি ড্র করে এবছর দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবল লিগের এক নম্বর স্থানটি দখল করার সুবাদে মির্জাপুর ইউনিয়ন আগামী ফুটবল মরশুমে ঘেরা মাঠে খেলবে। মির্জাপুর ইউনিয়ন ১৯৪৮ সালে অ্যালেন লিগ খেলে, চতুর্থ ডিভিসনে উঠে আসে '৫৭ সালে। টানা ১৪ বছর পর ৭১ সালে তারা তৃতীয় ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে '৭৮ সাল থেকে। এবছর ১৯ বার বিপক্ষ জালে বল পাঠিয়েছে। নিজেদের জালে বল ঢুকেছে চার বার। দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশী গোল করেছে শোভন চক্রবর্তী। মির্জাপুর ইউনিয়নের সঙ্গে আরও যে তিনটি টিম আগামী মরশুমে ঘেরা মাঠে খেলবে তারা হোল : ঐক্য সম্মিলনী, (১৮-৮-১০-০), বেহালা ইয়ুথ (১৮-৮-৭-৩) ও বাটা স্পোর্টস ক্লাব (১৮-৮-৬-৪)। এদের মধ্যে বাটা ও ঐক্য সম্মিলনী এর আগে প্রথম ডিভিসন লিগে খেলেছে। অবনমনের বিধিতে রবার্ট হাডসন, অরোরা, বেলেঘাটা এবং মৌরি স্পোর্টিং ক্লাব সামনের বছর তৃতীয় ডিভিসনে নেমে গেল।

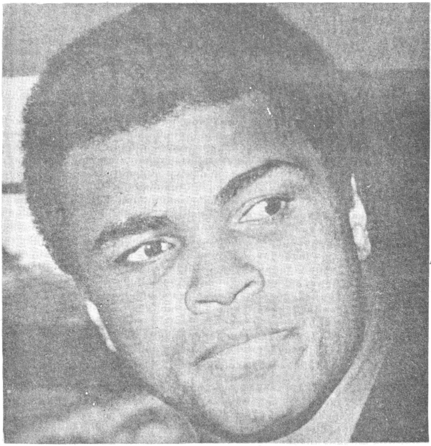
মির্জাপুর ইউনিয়ন : পল্লব মুখার্জি, প্রদীপ কর্মকার, শেখ সাবিরুদ্দিন, শিবশঙ্কর মুখার্জি, অরুণ নন্দী, সাধন ভট্টাচার্য, সঞ্জিত মজুমদার, সত্যব্রত চ্যাটার্জি, অসীম সাহা, শোভন চক্রবর্তী, প্রবীর সেন, শৈলেশ মল্লিক, তপন দাস, মৃণালকান্তি ঘোষ, দেবদ্যুতি দাস ও সুব্রত ব্যানার্জি (অধিনায়ক)।

কোচ : সঞ্জীব বসু।

'ভারতে ক্রিকেট খেলা কি বন্ধ হওয়া উচিত ?'

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে 'ভারতে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত' বিষয় নিয়ে ১০ আগস্ট এক বিতর্ক সভা হয়। পক্ষে পাঁচজন ও বিপক্ষে চারজন সদস্য আলোচনা করেন। বিচারকরা বিপক্ষ দলের অনুকূলে রায় দেন। শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার পান শিবসাধন সিংহ। শ্রীসিংহ প্রস্তাবের পক্ষে বলেন।

সভায় ক্যানসার ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডাঃ জয়শ্রী রায়চৌধুরী ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি কানাইলাল ভট্টাচার্য বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। 'খেলার আসরে'র সম্পাদক অতুল মুখার্জি বিচারকদের সাহায্য করেন।



শতাব্দীর বিস্ময় সুপার হিউম্যান হেভিওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

আলি অবসর নিলেন

বিপ্লব রায় : মহম্মদ আলি তাহলে সিংহাসন ছাড়লেন।

ঘটনাটা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না কারুর কারুর। অথবা সন্দেহ ?

দুটোর যে কোনোটাই হোক বা না হোক প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি কিন্তু অনেকটা অলক্ষ্যেই ঘটে গেছে। জুনের শেষদিকে আলি বিশ্ব বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনকে এক চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন তিনি অবসর নিচ্ছেন। তারিখটাও বলে দিয়েছিলেন : ৫ জুলাই। স্বভাবসিদ্ধ হুংকার ছেড়ে বাক্যবাগীশ লোকটি বানপ্রস্থ নেবেন এই ধারণাও যে কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তাও কি কেউ ভেবেছিল ? অথচ হয়েছে তাই। ৫ জুলাই আলির মুখ থেকে একটিও কথা শোনা যায়নি। বরং তার ছয় দিন পর বিশ্ব বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে দিয়েছে যেহেতু আলি আর বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন নেই সুতরাং নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কে সেই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। তারই লড়াই হবে অক্টোবরের দুই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের জন টেট আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাল্লো নোয়েটেজির মধ্যে। সে লড়াই এর স্থান নির্বাচিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার শহর প্রিটোরিয়ার রাগবি স্টেডিয়াম।

তা এসব তথ্য তালাশে যত না আগ্রহ থাকার কথা তার চেয়ে বেশী আগ্রহ স্বভাবতই আলির সরে যাওয়ায়। হেভিওয়েট বক্সিং-এর এই প্রবাদ পুরুষ যে কোনোদিন বক্সিং রিং ছেড়ে চলে যাবেন, এই সম্ভাবনাটাই বুঝি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কালে কালে। বিলুপ্তির মধ্যে থেকে তাকেই টেনে তুলে আলি যেন যাবার বেলায়ও চমকে দিয়ে গেলেন ব্রহ্মাণ্ডের মানুষকে।

কত ঘটনা, কত স্মৃতিই ভিড় করে আসছে আজ। বক্সিং রিং-এ আর হয়ত কোনোদিনই হাজির হবেন না তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘুঁষির ঘায়ে কাত করে জয়ের জিঘাংসা নিয়ে। রিং-এ দাঁড়িয়ে ভয়াল ভয়ঙ্কর মুখব্যাদন তাও আর চোখে পড়বে না। কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে হুল ফোটানোর নিরন্তর বাসনা নিয়েও কেউ কি হাজির হবে তার মত দুনিয়ার সামনে ?

ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এসবের উত্তর কাউকে এখনই আদো উৎসাহিত করবে না। সুতরাং ও প্রসঙ্গ চাপা থাক।

শতাব্দীর বিস্ময় এই সুপার হিউম্যানের রিং থেকে বিদায়ের ব্যাপারটা অনেকেই শুনে নিয়েছে এতদিনের মধ্যে। শুধু এটাই বোঝেনি তারা, আলি থাকবেন কি যাবেন সে বিচারের এক্তিয়ার শুধু তারই। যেহেতু হিটলারের মত অসম্ভব বস্তুটা তিনিও ডিক্সনারি থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলেন অনেক অনেক কাল আগেই।

১৯৭৩-এর সেই দিনটার কথা মনে পড়ে ? পয়লা এপ্রিল। আগের দিন স্যান ডিয়াগোতে আলি হেরে গিয়েছিলেন কেন নর্টনের কাছে। খবরের কাগজে তার এই পরাজয়ের চিত্রটি অক্ষরের আঁচড়ে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে তাই ভাবতেই যেন শিউরে উঠেছিলেন তিনি। 'মহম্মদ আলির শেষ', 'একটা যুগের পতন হল', 'এক উদোমাদার কাছে হেরে আলিকে যেতে হল', 'ওই বিরাট মুখ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।' বিচিত্র যত শব্দ দিয়ে তৈরি হেডিং-এর সারি যেন নেচে নেচে যাচ্ছিল চোখের সামনে দিয়ে।

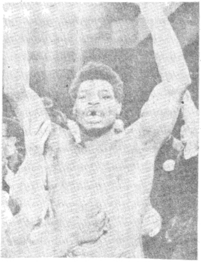
একজনই বোধহয় জানতেন শেষ এখানেই নয়। এখনও অনেক পথ যেতে হবে, অনেক কাজ বাকি। 'লং ওয়ে টু গো। আপহিল টাস্ক।' এবং সেই মানুষটি, মহম্মদ আলি নিজে। ১৯৫৬-র সেই বৃষ্টিঝরা দিনটা যেন বড় বেশী নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল তাকে। কত বয়স তখন তার, বড় জোর চোদ্দ। লুইসভিলের রাস্তা বেয়ে নিজের ছোট্ট স্কুটারে আলি চলেছিলেন। না, আলি নয়। তখন তিনি ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে।

একরাশ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল সারা শরীরে। একটা গাড়ির মধ্যে থেকে রেডিওর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল বাতাসে। ক্লে ব্রেক কষলেন। পিছলে যাওয়া স্কুটারটাকে টেনে ফিরে এলেন যখন গাড়িটার পাশে, ঘোষকের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এসে বিঁধল কানে। 'অ্যাণ্ড স্টিল দ্য হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দ্য ওয়ার্ল্ড, রকি মার্সিয়ানো।'

আস্তে আস্তে সরে এসেছিলেন ক্লে তারপর। একটাই চিন্তা পাক খেয়ে খেয়ে উঠেছিল তার ভেতর থেকে। 'রকি মার্সিয়ানো নয়, আমি চাই ওটা আমার সম্পর্কেই বলা হোক।' সেই চাওয়া নিয়েই ক্লে অবিরাম ছুটে গেছেন সামনের দিকে, পরের এই তেইশটা বছর। সম্মানের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে তাকে পৌঁছতেই হবে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই শুধু এগিয়ে যাওয়া।

১৯৪২-এর ১৭ জানুয়ারি তার জন্ম লুইসভিলে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারটা যে কি, শৈশব বা কৈশোরে ক্লে কখনোই তা জানতে পারেননি। বিরাট মাথাটাকে দেখিয়ে দশ বছর বয়স থেকে যখন তিনি বলতেন—বক্সার হতেই আমার জন্ম, তাতেও কেউ বড় একটা কর্ণপাত করেনি। শুধু ওডেটা ক্লে-ই বুঝি জানতেন

কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। মাত্র আঠারো মাসের ক্যাসিয়াসের এক ঘু'ষিতে ওডেটার দাঁত নড়ে যায়। যার পরিণতিতে সবগুলো দাঁতই গেছে আজ ওডেটার। ছেলে যে সত্যিই বক্সার হয়েছে ফোকলা গালই ওডেটার কাছে আজ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।



১৯৭৮-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি লাসভেগাস-এর রিং-এ খেতাব জিতলেন লিওন স্পিংকস

'যোসেফ এল্ল সবি মার্টিনের কলম্বিয়া জিম-এ ক্লে প্রথম গিয়ে ঢুকেছিলেন বক্সিং শিখতে। বেশীদিন ক্লে থাকেননি সেখানে। কিভাবে পা ফেলতে হয় আর আড়াআড়ি ঘু'ষি হাঁকড়াতে হয় এর বেশী কিছু শেখানোর ক্ষমতা মার্টিনের ছিল না। ফ্রেড স্টোনারের বক্সিং জিম যেন টানছিল তাকে। ওখানে যারা শেখে তারা পাল্টা ঘু'ষি হাঁকড়াতে পারে এবং নির্ভুলভাবেই। উপরন্তু হাত চলে তাদের যেন ঝড়ের গতিতে। টাইমিং ভাল এবং ডিফেন্সও।

ক্লে তার আত্মজীবনী 'দ্য গ্রেটেস্ট'-এর এক জায়গায় লিখেছেন, 'ফ্রেড এর জিম-এ যে পরিশ্রম করতে হত তা অমানুষিক। শিক্ষা যেন সেখানে ছিল ধর্মের মত।' দিনের পর দিন আলি আর এক কাজ করতেন। টেলিভিসনে বিভিন্ন বক্সারের লড়াই দেখা। জিনি ফুলমার, র‍্যালফ জোনস, কারমেন বাসিলোর লড়াই তিনি খু'টিয়ে খু'টিয়ে দেখতেন। তাদের রিং-এ দাঁড়ানোর ভঙ্গী, ঘু'ষি খাওয়া আর পাল্টা আঘাত করার কায়দা, সবই।

একাগ্রতা, পরিশ্রম আর নিষ্ঠা যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে ক্লে যেন তার এক জলন্ত প্রমাণ। আলি বলেছেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর কাজ যে একটা বিজ্ঞান আমি সেটাই শিখেছিলুম। ঘু'ষির আওতার মধ্যে নিজের মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘু'ষি হাঁকড়ানোর লোভ দেখানো এবং সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিয়ে তাকে বেসামাল করে দেওয়ার শিক্ষা আমাকে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল।'

রিং-এ দাঁড়িয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তোলাটাই যে আগে দরকার আলি সেটাও জানতেন। এর দ্বারা কখন ডানদিকে বা বাঁদিকে সরতে হবে কখন-ই বা মাথাকে এগোতে কি পিছোতে হবে সে ব্যাপারগুলি অনায়াসে সম্ভব হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর সব শক্তি দিয়ে হাঁকড়ানো ঘু'ষিগুলো যদি নেহাতই শূন্যে আস্ফালন করে তোলা যায় তবে তাকে মানসিক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা যায় আস্তে আস্তে এই সত্যটুকু যেন ছিল আমার সম্পদ। আলিরই উক্তি এটা।

মার্টিন কি স্টোনার আলির বালোর দুই গুরুই মৌমাছির মত একটা কথা গুনগুন করে গেছেন কানের পাশে, ওলিম্পিকে সোনা পাওয়ার চেয়ে দামী আর কিছুই নেই জেনো। একজন



সাতমাস বাদে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনুরাগীদের কাঁধে আলি

বক্সারের কাছে মিলিয়ন ডলারেরও দাম এত নয়। এটা পেলে সারা দেশ তোমাকে মাথায় করে রাখবে। এ এমন এক জিনিস যা তুমি কোনদিন ভুলতে পারবে না।

চুয়ান্ন থেকে ষাট এই সাত বছরের অপেশাদার লড়াই তাকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিল ১৯৬০-এর রোম ওলিম্পিক তার প্রমাণ বয়ে নিয়ে আসে। লাইট হেভিওয়েটে তিনি সোনা জিতে নেন স্বচ্ছন্দে।

তারপর। তারপরের কথা শুনলে কি কারও চোয়াল ঝুলে পড়বে বিস্ময় অথবা আতঙ্কে? একটা জোয়ান মদ্দর পাগলামি শুনে হাসতে প্রাণ চাইবে কারো? ১৯৬০-এর গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে জেফারসন কাউন্টি ব্রিজের ওপর থেকে আলি সেই ওলিম্পিকের সোনার পদকটি ছু'ড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ওহিও নদীর জলে। দেখতে দেখতে তার চোখের সামনেই সেটা তলিয়ে গেল যেন অতলান্তে।

কেউ দেখেনি সেদিন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের মুখখানা। কঠিন চোয়াল জোড়ার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল যেন গালের হনু দুটো। তীক্ষ্ণ জলজলে চোখ জোড়া শুধু ভবিষ্যতের দিকে, যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'এভাবে নয়, এভাবে নয়, আমি আমার নিজের ধরনে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। এবং হবোই।'

(চলবে)

হকির পুরস্কার সভা হল রোটাণ্ডায়

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার, ৭ আগস্টের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাস দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংসের রোটাণ্ডায় হল। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব অমিয় সেন সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে উপস্থিতির সংখ্যা চল্লিশের বেশী হয়নি। বেটন কাপের পুরস্কার আগেই খেলার মাঠে দেওয়া হয়। একটি মামলার জন্য প্রথম ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নটির মীমাংসা হতে দেরী হয়। মঙ্গলবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের লক্ষ্মীবিলাস কাপ, ম্যাগডেন শিল্ড, কাইভীন কাপ ও পঙ্কজ গুপ্ত মেমোরিয়াল কাপের বিজয়ী ও বিজেতাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রথম ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে হাজির হন। মোহনবাগানের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না।

মুখ্যসচিব তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি অফিস, ময়দানে তাঁবু ও নিজস্ব মাঠের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন, দাবিটা অনেকদিন বাদে এসেছে। তবে একটা ব্যবস্থা হবে আশ্বাস দেন। শ্রীসেন তার ভাষণে প্রাক্তন সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলীর কাজের প্রশংসা করেন এবং প্রকারান্তরে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

সম্পাদক নির্মল দত্ত জানান, গত মরশুমে গট আপ ম্যাচ বিশেষ হতে পারেনি। তিনি কলকাতায় অন্য রাজ্যের হকি খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করার নীতির বিরোধিতা করেন। ■

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায়   রেখা : জি. সান্তা



দ্বিজুদার আশেপাশে

দিগ্‌ দর্শক ঃ দ্বিজুদার কাছে অখিলেশ্বর প্রায়ই ধর্ণা দিত। বলত দ্বিজুদা আর ত পারছি না—সংসার চালানো দায় হয়ে উঠল। যে চাকরী করছি তাতে সংসারের অনেক ছিদ্রের কয়েকটিতে মাত্র জোড়াতালি দেওয়া যায়। ভাল চাকরি-টাকরির জোগাড় করে দিন। একটা নিদেন পক্ষে কিছু উপরি রোজগারের ব্যবস্থা।

দ্বিজুদার নিজেরই সেই অবস্থা। নেহাত ঠাকুর্দার বাড়ির এক কোণে দুটি ঘর পেয়ে গেছেন, নইলে এই বাজারে কোথায় থাকতেন তিনি? আর পিতৃদেব বুদ্ধি করে তার সম্পত্তি এমনভাবে বেঁধে রেখে গেছেন যে তা থেকে কেবল বাৎসরিক একটা আয় তার হাতে এসে পড়ে। তাতে খাওয়া পরা চলে যায় কোনো মতে। এই কারণেই তিনি আজ মাঝে মাঝে রেফারিগিরি করতে পারেন। তারও তো উপরি আয় দরকার। বহুদিন থেকে তার একটা স্কুটারের শখ—কিন্তু হাতে টাকাই জমে না। যখনি জমে তখনি একটা না একটা সাংসারিক প্রয়োজন এসে হাজির হয়। তিনি অখিলেশ্বরকে বললেন, উপরি আয় করতে চাস তো যা হাওড়া স্টেশনে, কুলিগিরি করগে। এক একটা কুলি পুজোর বাজারে মাসে দু/তিন হাজার টাকা রোজগার করে নেয়, প্ল্যাটফর্মে ঘুমোয়, রোজ পাঁচ টাকার খাওয়া-দাওয়া করে। বাকি টাকা সব দেশমে ভেজ দেয়। বুঝলি, এক একটা কুলির দেশে দুশো বিঘে জমি, গরু, পুকুর—ভাবতে পারিস?

অখিলেশ্বর বলে, তা দাদা ওসব নিচু কাজ আমাদের সহ্য হবে কেন। ওসব কাজে নানারকম ঝামেলা, এটা করো, সেটা করো, বেঞ্চ দখল করো, প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করো, ভাল কেউ তিন টাকা দিলে হম্বি তম্বি করে তার কাছে থেকে সাত টাকা আদায় করো। অত সব কি আমার দ্বারা হবে?

দ্বিজুদা বললেন, তবে কি টিউশনি করবে নাকি? তাতেও আজকাল এক একজন লোক দু/তিন হাজার কামিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তোমার বিদ্যে তো জানি। হয়ত ভূগোল পড়াতে গিয়ে ছাত্রকেই জিজ্ঞেস করে বসবে উপসাগর কারে কয়? হ্যাঁ বাবা, তোমার বিদ্যে আমার জানা আছে!

অখিলেশ্বর তা শুনে বলল, তা দাদা জানেনই তো আমার বিদ্যে। নেহাত শ্বশুরের জানা ল্যাংফোর্ড সাহেব আমাকে কেরানী বহাল করেছিলেন, নইলে আমার কোনো বিদ্যেই নেই। তবে এখন পৃথিবীর নানা ব্যাপার আমি শিখে ফেলেছি। বুঝলেন দ্বিজুদা, টাকা চাই। টাকা ছাড়া এক পাও কোথাও যাওয়া যায় না। টাকা ছাড়া কেউ আত্মীয় নয়, টাকা থাকলে সকলেই আত্মীয়! তা ছাড়া এমনিতে কেউ বন্ধু নয়—টাকার গন্ধ পেলে কিন্তু সবাই বন্ধু!

দ্বিজুদা বললেন, তবে আর কি, আসল সার তো জেনেই ফেলেছ বন্ধু, এবার টাকা রোজগার কর! কিন্তু দু/পাঁচ টাকায় তো হবে না—টাকা যত বেশি, বন্ধু আত্মীয় তত বেশি, কি বল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অখিলেশ্বর বলল।

দ্বিজুদা বললেন, একটা জিনিস করতে পার, বহুদিন ধরে যেটা আমি নিজেই করব ভাবছি। কিন্তু বুঝলে না তাতে একটু ইয়ে আছে।

অখিলেশ্বর বলল, যে জিনিসে আপনার ইয়ে আছে তাতে বুঝি আমার ইয়ে নেই?

দ্বিজুদা বললেন, না ভাই—আমি তো মাঠে যাই। লক্ষ লক্ষ লোক আমার নাম জানে। লোকেদের আমার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা আছে। বুঝলে অখিলেশ্বর—জিনিসটা যে খুব একটা পাপ কাজ তা নয়। তবে একটু ইয়ে আর কি।

অখিলেশ্বর অধীর হয়ে বলল, বলুন না—বলুন না দাদা, একটু ইয়ে হোক—টাকা আসবে তো?

—অঢেল। দ্বিজুদা বললেন।

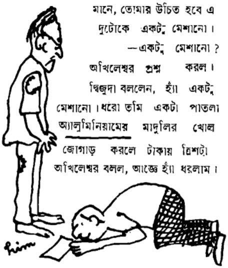
—অঢেল? অখিলেশ্বর চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করল।

দ্বিজুদা বললেন, কী করতে হবে বলি শোনো। আমাদের এই ফুটবল-পাগলের দেশ থেকে নিজেদের একটু হিল্লে করে নিতে হবে। এটা কেবল ফুটবল পাগলের দেশ নয় এ ভূত প্রেত দৈত্য দানো মাদুলি তাবিজের দেশও বটে। এখন আমাদের—মানে, তোমার উচিত হবে এ দুটোকে একটু মেশানো।

—একটু মেশানো? অখিলেশ্বর প্রশ্ন করল।

দ্বিজুদা বললেন, হ্যাঁ একটু মেশানো। ধরো তুমি একটা পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের মাদুলির খোল জোগাড় করলে টাকায় ত্রিশটা।

অখিলেশ্বর বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ ধরলাম।



দ্বিজুদা বলল, ধরো তাতে একটা ধান আর একটা দুর্বো, তার সঙ্গে ফুলের এক চিলতে পাপড়ি ভরে দিলে।

অখিলেশ্বর বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ সেটাও ধরলাম।

—এবারে—দ্বিজুদা বললেন, এবারে প্রতিটি মাদুলিতে কত খরচ পড়ল?

হিসেব করে অখিলেশ্বর বলল, পয়সা পাঁচেকেরও কম।

দ্বিজুদা বললেন, চমৎকার কথা। এর চেয়ে ভাল কথা আর কি হতে পারে? এবারে ওই মাদুলিতে একটা কালো সুতো বেঁধে দাও, এক টাকার সুতোয় দুশো মাদুলি হয়ে যাবে। এখন প্রস্তুত—কেবল বোকাদের এগুলো এক একটা এক এক টাকায় বেচলেই হল।

অখিলেশ্বরর বলল, এক একটা এক এক টাকায় তারা কিনবে কেন?

দ্বিজুদা বললেন, কেন—এই মাদুলি পরলে যে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, কালিঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং ইত্যাদি সব দলই জিতবে!

অখিলেশ্বর বলল, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? একই মাদুলি, মানে একই রকম মাদুলি একই লোকের কাছ থেকে কিনে দুরকম কি তিন রকম ফল হবে এ কেউ বিশ্বাস করবে না।

দ্বিজুদা বললেন, ঠিক আছে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তুমি তো আর নিজে এসব বেচবে না। তুমি লোক লাগাবে। তারা তোমার কাছ থেকে একটা মাদুলি পঞ্চান্ন পয়সায় কিনে নিয়ে যাবে, আর বিক্রী করবে এক টাকায়। তোমার নেট লাভ হবে পঞ্চাশ পয়সা। এখন যদি প্রতি মরশুমে লাখ খানেক মাদুলি বিক্রী করতে পার তাহলেই পঞ্চাশ হাজার!

অখিলেশ্বর পঞ্চাশ হাজার টাকা শুনে ঢোক গিলল। তারপর এ কথা সে কথার পর চলে গেল।

মাস দুই পর দ্বিজুদা বাড়িতে বসে বসে একা একাই দু'প্যাকেট তাস নিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। এমন সময় একটা গাড়িতে করে অখিলেশ্বর এসে হাজির। দ্বিজুদা বললেন, ব্যাপার কি?

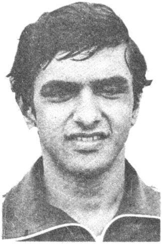
অখিলেশ্বর বলল, আপনার পায়ের ধুলো নিতে এসেছি। আর সঙ্গে একটি চেকও এনেছি। দাদা, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। দাদা, আপনি আমার নমস্য। বলে অখিলেশ্বর নত হয়ে দ্বিজুদাকে প্রণাম করল। পায়ের কাছে রাখল একখানি চেক।

অখিলেশ্বর চলে গেলে দ্বিজুদা দেখলেন, চেকের উপর লেখা পাঁচ হাজার টাকা। দ্বিজুদার মনে আনন্দ হল খুবই কিন্তু দেশের কথা ভেবে চোখে কয়েক ফোঁটা জলও এল। ●

সাবাস প্রকাশ

একটি লেখা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে, সেটি আর শ্রীমনের লেখা 'খেলোয়াড় তৈরির জন্য প্রকাশ পাড়ুকোনের অভিনব প্রয়াস' প্রকাশ ও তার সতীর্থদের অভিনন্দন জানাই নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রমাণিত হল।

শ্রীমন যদিও সঙ্গে সঙ্গেই বেদী, গাভাসকর, উমরিগড়, অমৃতরাজ প্রমুখ রথী-মহারথীদের ব্যবহারও উল্লেখ করেছেন তাই



আমি তাদের কাছে এই অনুরোধই কার যে, আগে যা করেছেন করেছেন। এখন অন্তত প্রকাশ ও তার সতীর্থদের দৃষ্টান্ত দেখে অনুরূপ কিছু করুন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ফুটবলারদের কাছেও আমি ওই একই অনুরোধ রাখছি। এই প্রচেষ্টায় আপনাদের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

অরূপ কুমার সিংহ, দেসুড়িয়া, বাঁকুড়া।

(২)

২৭ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'খেলোয়াড় তৈরির জন্য প্রকাশ পাড়ুকোনের অভিনব প্রয়াস' লেখাটি পড়ে ভালো লাগলো। প্রতি-শ্রুতিবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের স্বার্থে খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল গঠন করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন ও তার সতীর্থরা যে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ক্রীড়ারসিক প্রত্যেকেই তাদের স্বাগত জানাবে। আন্তর্জাতিক খেলার আসরে পিছিয়ে পড়া ভারতকে যারা সম্মান এনে দিতে পারে এমন সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়দের উপেক্ষা করে ক্রীড়া জগতের কেষ্ট—বিষ্টুদের খেলাধূলা থেকে ফয়দা ওঠানোর সাবেকী ট্র্যাডিশনে এবার আঁচড় লাগবে।

খেলোয়াড় তৈরির জন্য পাড়ুকোনের এই বলিষ্ঠ প্রয়াস খেলাধূলার অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উজ্জীবিত করলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

তুহিন বসু, কলকাতা-১২।

মজার ছড়া

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'খেলার মাঠের মজার ছড়া' (৩ আগস্ট) খুব ভাল লাগল। তবে দ্বিতীয় ছড়াটির প্রথম লাইনের শুরুতে 'বাঙালী না মুসলিম' কথাটা চোখে এবং কানে লাগে। বাঙালীর মধ্যে 'মুসলিম' নেই, কিংবা মুসলিমদের মধ্যে 'বাঙালী' ?

ত্রিদিব ঘোষ, বাটানগর, ২৪ পরগনা।

সমরেশ তোমার তুলনা কোথায়

ঠিক সময়ে হাজির হয়ে মহামেডানের গোললাইন থেকে গোল বাঁচিয়ে প্রমাণ করেছ তুমি এখনো ফুরিয়ে যাওনি। তোমার ন্যায় নিষ্ঠা ও আনুগত্যকে অবহেলা করে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা তার যথার্থ মূল্য দিলেন।

সমরেশ তুমি ধন্য। ধন্য অমল দত্ত। তোমরা আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

সুনির্মল ধরচৌধুরী, সুনয়ন ধরচৌধুরী, মন্দিরা ধরচৌধুরী, আগরতলা ত্রিপুরা।

তপন দাসের চিঠি

অধিকার কার আছে ?

৩ আগস্টের খেলার আসরে তপন দাস লিখিত 'অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করুন' পড়ে খুবই দুঃখ পেলাম। একজন নামী ফুটবলারের ব্যক্তিগত চরিত্রে কালিমা লেপন করা কার অধিকার আছে ? আমার প্রশ্ন সেইসব লেখিকাদের। আগে নিজেদের কলঙ্কিত চরিত্রের রূপ দর্পনের সামনে প্রতিফলিত করে, পরে অন্যের ব্যক্তিগত বিচারের ভার নেবেন।

দীপা, অঞ্জলী—অণ্ডাল, বর্ধমান।

খেলার মাঠে চেঁচায় কারা !

২ আগস্ট মোহনবাগান বনাম রাজস্থানের ফুটবল ধারাবিবরণী শুনছিলাম। আমরা প্রবাসী ফুটবল প্রিয় বাঙালীরা দুধের সাধ ঘোলে মেটাই ওই ধারাবিবরণী শ্রবণ করে।

পাঠকের কলমে

কিন্তু সেদিনের খেলার শেষে যখন ধারা-ভাষ্যকার খেলার ফলাফলের গুণগত বিশ্লেষণ করছিলেন সেই মুহূর্তে মোহনবাগানের সমর্থকরা যেভাবে গো-ও-ল, গো-ও-ল বলে চিৎকার করছিলেন এবং ধারাভাষ্যকারকে ফোর্স করছিলেন মানস ভট্টাচার্যের গগন চুম্বী প্রসংশা করতে, তাতে মনে হচ্ছিল ওরা ফুটবল পাগল, বা স্থানটা খেলার মাঠও নয়। বোধ হয় রাঁচীর পাগলা গারদ নয়তো ৪২-এর দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্ত মানুষের চিৎকার যা টেপ রেকর্ডে পুনঃপ্রচার করা হচ্ছিল।

যারা খেলা দেখেন তারা তো ভাগ্যবান। কিন্তু যারা শুধু শ্রবণ করে নিজেদের কিছুটা ভাগ্যবান মনে করেন তাদের কাছে ধারাবিবরণী শোনায় ব্যাঘাত ঘটলে কি অবস্থা হয়।

বিশ্বরঞ্জন ভৌমিক, সেক্টর-১৩ রাউরকেলা-৯।

ক্রীড়া সাহিত্য যেমন হওয়া দরকার

যারা খেলেন তারা লেখেন না। যারা লেখেন তারা খেলেন না। এই রীতি অনেককালই চালু ছিল। খেলোয়াড়দের যা লেখা মাঝে মধ্যে বেরুতো তার অধিকাংশই সাংবাদিকেরা খেলোয়াড়দের বকলমে লিখতেন।

আজ কিন্তু যারা খেলেন তাদের অনেকেই লেখেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি-বান অনেকেই আছেন যারা নিজেদের অতীত বর্তমান অভিজ্ঞতার কথা লেখেন এবং উত্তর-সূরীদের সামনে 'প্রগতির পথ' তুলে ধরার চেষ্টা অন্তত করেন।

এখানেই বর্তমান খেলোয়াড়দের (বিশেষ করে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়দের) বিশিষ্ট। অবশ্য অধিকাংশ খেলোয়াড় তাদের খেলোয়াড়জীবন শেষ করে তবে লিখতে বসেন। কেউ কেউ আছেন যারা খেলোয়াড় জীবন-যাপনকালেই কলম ধরেন। আবার খুব কম খেলোয়াড়ই আছেন যারা চলন্ত খেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে বোধহয় রেকর্ড করেছেন সুনীলমনোহর গাভাসকর। তিনি গত কলকাতা ক্রিকেট টেস্টে 'অধিনায়ক' রূপে অংশগ্রহণ করেও দৈনন্দিন খেলার বিবরণ নিজস্ব রসগ্রাহী দৃষ্টিতে সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন আমাদের ফুটবল দিকপালদের মধ্যে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে প্রাক্তন ফুটবলার চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি, শৈলেন মান্না, সুকুমার সমাজপতি উল্লেখ-যোগ্য। তবে আমরা আশা করবো, যে সমস্ত খেলোয়াড় সাংবাদিকের বেশ ধারণ করেছেন তারা সুচিন্তিত, তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সাহিত্যরসে কিঞ্চিৎ মনোগ্রাহী লেখা পরিবেশন করেন। কারণ, শুধু সংখ্যা ও তথ্য শুষ্ক মেরুর মতই অনুভব্য, আমরা চাই মরুভূমিতে মরূদ্যান। ক্রীড়া সাহিত্য সারা বিশ্বেই আজ বিশিষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

অরুণকান্তি লাহিড়ী, পঞ্চাননতলা লেন, কলকাতা-২০।

কমল ভাণ্ডারীর ছাতি

২৭ জুলাই 'কমল ভাণ্ডারী গ্রীক নায়কের মত যার চেহারা'—লেখাটি পড়লাম। লেখক লিখেছেন যে কমল ভাণ্ডারীর বুকের ছাতির মাপ ৪০ ইঞ্চি। এই মাপটা কোন্ সময়কার মাপ ? কারণ শ্রীভাণ্ডারী যখন 'ভারতশ্রী' হয়েছেন বা 'বিশ্বশ্রী' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন তখন তার বুকের ছাতির মাপ ছিল ৫০ ইঞ্চি।

দিবাকর ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

ভাষ্যকারের কাজ কি ?

১ জুলাই ইস্টবেঙ্গল বনাম ভ্রাতৃ সংঘের খেলার রিলে শুনছিলাম, ওদিন জনৈক ভাষ্যকার কিন্তু মাঝে মাঝেই রেফারির ভুল ধরছিলেন। জানি না ওর প্রকৃত কাজ কি ? মনে হয়, মাঠে যা খেলা হচ্ছে, রেফারি যা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, ওটাই পুরোপুরি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই ভাষ্যকারদের রিলে করতে দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হচ্ছিল না।

যেমন সুরজিৎ সেনগুপ্ত যখন অজিত চক্রবর্তীকে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়েছেন, তখন অজিত চক্রবর্তী সুরজিতকে রুখতে না পেরে বাধ্য হয়েই সুরজিতকে অবৈধভাবে বাধা দেন, এবং রেফারি পেনাল্টি দেন। কিন্তু ভাষ্যকার বলেন যে, 'সুরজিতকে এমন কিছু অবৈধভাবে বাধা দেওয়া হয়নি যে ওটা পেনাল্টি হবে।' অবশ্য কিছু পরে ভাষ্যকার বলেন যে, 'রেফারি যখন পেনাল্টি দিয়েছেন, তখন ওটা পেনাল্টি হবে।'

আমার প্রশ্ন, ভাষ্যকার কি ওখানে রেফারির ভুল ধরবার জন্য বসে আছেন ? ভাষ্যকারের কথা মতই মানলাম, ওটা হয়ত পেনাল্টি নয়। কিন্তু তাই বলে শ্রোতাদের কাছে কি ওভাবে বলা উচিত ? যেখানে মাঠের খেলা পরিচালনার দায়িত্ব রেফারির, উনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা পছন্দসই না হলেও খেলোয়াড়েরা মেনে নেন। সেখানে আজেবাজে বলে রেফারির ভাবমূর্তি শ্রোতাদের কাছে খারাপ করবার অধিকার ভাষ্যকারদের কি আছে ?

জহর দাস, সিঁথি, কলকাতা-৭০০০৫০

এ লজ্জা শুধু কি আমাদের ?

২৭ জুলাই খেলার আসর মারফৎ মণি সেন মহাশয়ের কথা জানতে পারলাম। এ রকম হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের কথা জনমানসে আপনারা তুলে ধরুন।

এ লজ্জা গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর। খেলার আসর এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী আমাদের উপহার দিচ্ছে বলে 'খেলার আসরের' কাছে চির কৃতজ্ঞ।

নীতিশ রায়, দেবগ্রাম, নদীয়া।

উচ্চবিত্ত কিশোরী ফ্যান

আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা হিসাবে, এই পত্রিকায় প্রকাশিত নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'উচ্চবিত্ত কিশোরী ফ্যান' রচনা এবং পাঠকের কলমে প্রকাশিত চম্পা ও শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত এবং প্রিয়াঙ্কা ম্যাক-লিয়ডের (?) চিঠির সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করছি।

(১) ওই রচনা লেখার সময় নীলিমা-দেবীর মনে থাকা উচিত ছিল যে আমরা প্রায় সব কিশোরীই এক একজন ফুটবলারের ফ্যান। কিন্তু তার স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীকে দেখেই 'সব কিশোরীই ফুটবলারদের বয়ফ্রেণ্ড বলে মনে করে' একথা কতকটা অযৌক্তিক। খেলোয়াড়-দের একটা আলাদা কোয়ালিফিকেশন আছে বলে আমরা তাদের কথা আলোচনা করি ঠিকই কিন্তু তাদের বয়ফ্রেণ্ড বলে মনে করি না। আমরা পূজক, তারা পূজ্য এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল।

(প্লিজ আমাদের এমন দর্শক ভাববেন না যারা পা জড়িয়ে ধরে বা মালা পরিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন এবং বড় দল থেকে চলে গেলেই তাদের দেখলেও চিনতে পারেন না। তাদের কাছে 'আজ' এবং 'এখন' ছাড়া কিছুই নেই।) আর আমরা গান বা অন্য কোনও শিল্পচর্চা আমাদের ভাল-লাগে বলেই করি। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়।

(২) চম্পা ও শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত প্রমুখ নীলিমাদেবীর লেখার প্রতিবাদ করার সময় দু'জন ফুটবলারের সম্পর্কে খুব খারাপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এইভাবে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। আর নীলিমাদেবীর মত তারাও ভুল করেছেন, একথা উল্লেখ করে যে, যেহেতু এই দু'জন ফুটবলার এই দোষ করেছেন যেহেতু বাংলার সব ফুটবলাররাই একই দোষে দোষী। টেলিফোনে জ্বালাতন করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর যাইহোক 'খেলার আসর' ব্যক্তিগত রোষ প্রকাশের জায়গা নয়।

(৩) সবশেষে বলি যে 'প্রিয়াঙ্কা ম্যাক-লিয়ডের' (?) অতটা আনন্দ প্রকাশ করার কারণ কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।

যদি তার কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করেন তাহলে সেটা কি খুব আনন্দের বিষয় হবে ?

ইন্দ্রানী, দেবারতি, অর্চনা, শুচিস্মিতা, গৌরী, সুতপা, গীতা, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

দূরদর্শন কেন্দ্রের কি কোন দায়িত্ব নেই

বাঙালী খেলা পাগল, বিশেষ করে ফুটবলের তিন প্রধানের খেলা থাকলে তাদের সমর্থকরা কলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চল থেকে সীমিত যানবাহনে নির্ভীক সাহসের উপর ভর করে মাঠে এসে উপস্থিত হয়। এরপর মাঠের অবস্থা যে কত করুণ ও নির্মম তা প্রত্যক্ষদর্শীরা অবহিত আছেন। লাইনে ঠেলাঠেলি, মারামারি ছাড়াও জলের জন্য হাহাকার এসব তো আছেই। খেলা শেষে বাস-ট্রামের মাথায়, দরজায়, জানালায় জনসমাবেশ রেকর্ডের দাবী রাখে। ট্রাম, বাসের ক্ষতি ছাড়াও ক্ষতি হয় নিত্য অফিস ফেরতা যাত্রীদের। এদের কেউ কেউ দৈনিক সংবাদপত্রে আবেদন করেছেন, সকালে বা রাত্রে খেলা চালানোর জন্য। এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রের অনেকটা দায়িত্ব আছে।

বেতার কেন্দ্র তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু দূরদর্শন কেন্দ্র এ ব্যাপারে একেবারে ব্যর্থ। আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা যদি প্রতিদিন মাঠ থেকে সরাসরি খেলা দেখান তবে জনসমাজ অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

সুদীপ্ত ঘোষ, বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

পুলিশের এই অত্যাচার কেন ?

মোহনবাগান মাঠে আয়োজিত মহমেডান বনাম ইস্টবেঙ্গল ফুটবল লিগ খেলার শেষে গত ৪.৮.৭৯ তারিখে একদল সমাজবিরোধীর অত্যাচারের ফলে নিরীহ দর্শকদের প্রতি কর্মরত পুলিশ যে নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে লাঠি চালায় এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তার জন্য শাস্তিস্বরূপ তাদের পুলিশি পোশাক খুলে নেওয়া হোক। কারণ তারা গোটা পুলিশ বিভাগকে অপমানিত করেছেন। অপমানিত করেছেন সত্যিকারের দস্যিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিরীহ দর্শকদের প্রতি নির্মমভাবে লাঠি চালিয়ে। এই অত্যাচার দমন করবার জন্য মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি সেই কংগ্রেস নেতা প্রিয়বাবুকে মারার জন্য ধিক্কার জানাই। এটা বড় লজ্জার কথা। দুঃখের কথা শুধু পুলিশ এতটা সাহস পেল কি করে? এটা কি পুলিশের রাজত্ব ?

গোপাল দে, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ধন্যবাদ

২০ জুলাই সংখ্যায় বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী, শিক্ষাব্রতী সম্প্রতি স্বর্গত অধ্যাপক দুর্গাশরণ চক্রবর্তী (খেলার জগতে ডি সি নামে অধিক পরিচিত) মহাশয়কে নিয়ে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য এই জনপ্রিয় ক্রীড়া সাপ্তাহিকের লেখক অতীতের খ্যাতিমান ক্রিকেটার প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনাদের এই জনপ্রিয় সাপ্তাহিক প্রমাণ করল খেলার জগত খালি খেলোয়াড়কে নিয়ে নয়। যারা খেলাধুলাকে প্রাণাধিক ভালবেসে নিজেকে দলাদলির ঊর্ধ্বে রেখে খেলোয়াড়দের প্রেরণা, উৎসাহ যুগিয়েছেন, সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন তাদেরকেও নিয়ে। যাইহোক আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ড এবং নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই অস্বাভাবিক খেলোয়াড়দরদী ক্রীড়াপ্রেমিককে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বোঝাতে চাইলেন অতীতকে আপনারা ভোলেননি।

দিলীপ চক্রবর্তী, অপূর্ব চক্রবর্তী, শেখর চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭।

স্বরাজ ঘোষের লেখা

আমি ফুটবল জগতের অজ্ঞ এক এলাকায় নিয়মিত গোলরক্ষণের ভূমিকায় অনুশীলন করি। আমাদের এখানে কোন প্রশিক্ষক নেই। সেই জন্যে যখন খেলার আসরে দেখতে পেলাম, স্বরাজ ঘোষ কি করে 'ফুটবলার হওয়া যায়'—সেই সম্বন্ধে নিয়মিত লিখবেন, তখন আমার মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল। কারণ আমাদের মত অখ্যাত ফুটবলাররাও কিছু শিখতে পারবে, সেই সঙ্গে 'খেলার আসর' পত্রিকার সম্পাদকের ধন্যবাদ প্রাপ্য কারণ তিনি এ সুযোগ এনে দিয়েছেন। কিন্তু আমার সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্বরাজবাবু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিলেন যে তার খেলা শেখাবার থেকেও উপমা দেবার প্রবণতা বেশী। যাই হোক, তাই পড়ছিলাম কারণ Something is better than nothing. কিন্তু তার ষষ্ঠ যোজনায় পড়লাম যে, তার নাকি এক এক সময় মনে হয় যে যারা দুর্বল ও যাদের দৌড়-ঝাঁপ করে খেলার ক্ষমতা নেই, তারাই ওই গোলকিপিং পজিশন বেছে নেয়। আমার বক্তব্য যে, তিনি গোলরক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন উপদেশ তো দিলেনই না, পরন্তু এই ধরনের আশাহত বাণী ব্যবহার করে আমাদের মত প্রত্যেক গোলরক্ষকের মনেই আঘাত দিয়ে বসলেন। তাই আমার স্বরাজবাবুর কাছে সবিনয় নিবেদন যে, বাংলার ফুটবলের উন্নতি না করেন, না করুন, কিন্তু দয়া করে এইভাবে বাংলার ফুটবলের অবনতির রাস্তা পরিষ্কার নাই বা করলেন। যদি কিছু অযৌক্তিক কটুভাষা প্রয়োগ করে থাকি তাহলে ক্ষমার চোখে দেখবেন।

স্বপন চট্টোপাধ্যায়, বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান।

সালে প্রসঙ্গে

আফসোসের বিষয় বিনু চ্যাটার্জির স্মৃতি-চারণে সালের খেলোয়াড় জীবনের চমকপ্রদ সাফল্যের অনেক কাহিনীই অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি :

১৯৪৮ সাল সালের খেলোয়াড় জীবনের আশাভঙ্গের, বেদনার এবং মধুর সাফল্যের একটি অসাধারণ মিশ্র বছর। ওই বছর অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখা সত্ত্বেও ভারতীয় ওলিম্পিক ফুটবল দলে সালের ডাক পড়েনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। কিন্তু খেলার মাঠে সালে এই পক্ষপাতিত্বের যে প্রতিশোধ নিলেন এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রকাশ্যে যেভাবে হেনস্থা করলেন তার আর কোন তুলনা ভারতীয় ফুটবলে আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। শিলংয়ের শৈল শিখরে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে লণ্ডনগামী ভারতীয় ওলিম্পিক ফুটবল দল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল সম্মিলিত একাদশের সঙ্গে একটি ট্রায়াল খেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সালে বিদ্যুৎগতিতে এবং চোখ ধাঁধানো পায়ের কারুকার্যে ওলিম্পিক দলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করলেন পরাব প্যালেন ও তাজমহম্মদের মত জবরদস্ত খেলোয়াড়দের পর্যদুস্ত করে এবং অবিচলিত চিত্তে অসহায় গোলরক্ষক ভরদ্বাজকে অনায়াস ভঙ্গীতে পরাভূত করেন। সলে সেদিন মাঠে যে বীরোচিত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তা নজীরবিহীন।

এরপরে এলো লণ্ডন ওলিম্পিকগামী চাইনিজ ওলিম্পিক ফুটবল দল। ইস্টবেঙ্গল দল তাদের দু'গোলে পরাভূত করেছিল। সালে সেদিনও একটি গোল করে কলকাতা ফুটবলের সুনাম উজ্জল করেছিলেন।

সম্ভবত ১৯৫১ সালে কলকাতায় এসেছিল সুইডেনের প্রখ্যাত ফুটবল দল গোস্টেবর্গ। ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে তারা ০-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। সেদিনও সালের দেওয়া একমাত্র গোলেই তারা পরাজিত হয়েছিল। সালেই ভারতীয় ফুটবলের একমাত্র তারকা যিনি স্বদেশের মাটিতে দুই বিদেশী দলকে পরাভূত করেছিলেন গোল দিয়ে।

রমেন সেনগুপ্ত, প্রসাদনগর, নয়াদিল্লি।

এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড, টোকিও ১৯৭৯

২০ জুলাই টোকিও থেকে অরুণ ব্যানার্জির লেখা এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডের বিবরণী পড়ে অবাক হলাম। এখানকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং খেলার আসরেও (ছবিসহ)



টোকিওগামী ভারতীয় দলে বাংলার তিনজন মেয়ে এবং একজন ছেলের কথা আমরা জেনেছিলাম। কিন্তু অরুণবাবুর লেখায় বাংলার দুটি মেয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার খুঁটি-নাটি বিবরণ পাওয়া গেল। অপর একটি মেয়ে অনিমা ব্রহ্মর কোন খবরই পাওয়া গেল না। অথচ টোকিও থেকে ভারতীয় দল ফিরে আসার পর আমরা জানতে পেরেছি যে : (১) মেয়েদের ৪ × ১০০ মিঃ রিলেতে একটি বাজে অজুহাতে অনিমাকে দৌড়তে দেওয়া হয়নি। (২) অনিমা টোকিওতে ৩. ৬. ৭৯ তারিখে মেয়েদের ৪০০ মিঃ দৌড়ের হিটে রীতিমত ভাল দৌড়ে (৫৬·৯৬ সেঃ) দ্বিতীয় হয়। পরে ওইদিনই ফাইনালে ভাল দৌড়তে পারেনি, ৮ম স্থান পায় (৫৮·৩ সেঃ)। কেন পারেনি সে বিচার বিশ্লেষণ কোচ এবং বিশেষজ্ঞরা করুন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য অনিমা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই খবরগুলো কি সত্যি? যদি সত্যি হয় তবে অরুণবাবু যিনি টোকিওগামী ভারতীয় দলের দু'জন ম্যানে-জারের অন্যতম ছিলেন, তিনি অনিমার নাম পর্যন্ত তার বিবরণীতে উল্লেখ করলেন না কেন ? সঠিক খবরের প্রত্যাশায় রইলাম।

অনুপ, সমর ও ললিতা সিংহ, জামসেদপুর।

৪ আগস্টের রেফারি ও লাইন্সম্যান

ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখতে আমি মালদা থেকে এখানে এসেছিলাম। খেলা দেখে আমার মনে হয়েছে রেফারি ও লাইন্সম্যান ইস্টবেঙ্গলকে '৭৯-র লিগ চ্যাম্পিয়ন থেকে সরিয়ে দিলেন। বিরতির কিছু আগে মহমেডান গোল এলাকায় জটলার মধ্য থেকে সাব্বির গোলে বল ঠেলে-ছিলেন এবং মহমেডানের কোন একজন খেলোয়াড় গোল লাইন থেকে বলটা হাত দিয়ে সরিয়ে দেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, রেফারি ওটা তো গোল দিলেনই না, উল্টে লাইন্স-ম্যানের পতাকা নাড়া দেখে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষেই ফ্রি-কিক দিলেন। যাদের সিদ্ধান্তের উপর ম্যাচের ভাগ্য নির্ভরশীল, তাদের থেকে এ ধরনের ভুল আশা করি না।

আশিস ঘোষ, ফিরোজপুর, মালদা।

খেলার মাঠে মেয়েদের আসন চাই

আজ পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা সমান অগ্রাধিকার লাভ করেছে, যা ভারতেও ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং ঘটেনি বাংলাতে। এবং সেই সঙ্গে পিছিয়েও নেই বাংলার মেয়েরা। প্রায় প্রতিটি খেলায় তারা সমান পারদর্শিতা দেখাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করছে না।

কিন্তু খেলাধূলা করা ছাড়া বহু বাংলার মেয়ে খেলাধূলার সম্বন্ধে উৎসাহী হলেও বিখ্যাত লিগ ফুটবল সচক্ষে দেখা তাদের ভাগ্যে জোটেনি। কারণ মেয়েদের জন্য কোন সামান্য আসনের দৈনিক টিকিটের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া মেয়েরা তো আর ছেলেদের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে পারবে না তাই মেয়েদের ভাগ্যে খেলা দেখা মোটামুটিভাবে হয়ে ওঠে না। তাই উৎসাহী বাংলার মেয়েদের তরফ থেকে আই এফ এ-র কাছে আমি একটি অনুরোধ করছি যে, অন্তত শ'খানেক আসন মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করে আমাদের উৎসাহে সজীবতা প্রদান করুন।

শর্মিষ্ঠা পাল, শিয়ালদহ রেলওয়ে কোয়ার্টার, কলকাতা-৭০০০০৯।

একটি প্রার্থনা

খেলার জগতে ভারতের গৌরব হকি এখন পঞ্চম স্থানে। ফুটবলের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ সামান্য চার কোটি মানুষের দেশ পূর্ব জার্মান গত ওলিম্পিকে ৪০টা সোনা পেয়েছে। আশ্চর্যবোধ করি আমাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা দেখে। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, সমস্ত ব্যাপারেই রাজ-নীতি এর অন্যতম কারণ। বিশ্ব ক্রিকেটে শ্রীলংকার কাছে ভারতের হার লজ্জাকর ব্যাপার। এই অবস্থায় আগামী বছরে মস্কো ওলিম্পিকে ভারতের যোগদান নিঃসন্দেহে হাস্যকর। যাইহোক, ভারতবাসী হিসাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ৬০ কোটি জনসংখ্যার দেশকে আগামী ওলিম্পিকে সোনা না দিলেও কয়েকটি রূপো বা ব্রোঞ্জ দিও।

সঞ্জয় দে, ট্যাংরা, কলকাতা-১৫

চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। মনে রাখবেন দু'পৃষ্ঠায় লেখা চিঠি ছাপান সম্ভব নাও হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না, চিঠি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য, কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।

একটি ভুলের মাশুল আজও দিতে হচ্ছে রমেন ভট্টাচার্যকে

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ '৭৭-এর ৯ জুলাই। লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুনের লড়াইয়ের তখন কয়েক মিনিট গড়িয়েছে। এমন সময় একটা উঁচু বল ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সে এল। শ্যামল ঘোষ হেড করার জন্য লাফাল। পারল না। পাশে ছিল আর এক স্টপার রমেন ভট্টাচার্য। ও তার উপর ড্রপ ভলি করার জন্য পা চালাল। কিন্তু পিছল মাঠে বলটা পড়েই ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গেল দ্রুত। এবং বলটা মহম্মদ হাবিবের পায়ে। বল পেয়েই হাবিব ছুটতে আরম্ভ করল, পিছনে মরিয়া হয়ে দৌড়তে লাগল রমেন। ইস্ট-সমর্থকদের বুক ধড়পড় করে উঠল—গেল বোধহয়। হাবিব বুঝতে পারছিল তার পিছনে একজন দৌড়ে আসছে বাধা দেবার জন্য। তাই তাড়াহুড়োয় অভিজ্ঞ হাবিব বক্সের উপর থেকে সট নেয় ভাস্করের হাতে। মনে শক্তি এল ইস্ট-সমর্থকদের এবং হাফ ছেড়ে বাঁচল আরও একজন—রমেন ভট্টাচার্য। বল গোলে ঢোকেনি। কিন্তু ঢুকলে ওর কপালে যা জুটত, না ঢুকেও তাই হল। ওই একটা ভুল রমেনের আশা জড়ানো এবং বিরাট সম্ভাবনাময় ফুটবল-জীবনে একটা গভীর কালো দাগ কেটে দিল। আমাদের দেড় ঘণ্টা-ব্যাপী গল্পের এক ফাঁকে রমেনকে প্রশ্ন করেছিলাম—স্মরণীয় ম্যাচ কোনটা? এক মুহূর্তও দেরী না করে উত্তর দিয়েছিল—সেই ৯ জুলাই। তারপর টানা হাসতে হাসতে বলেছিল—তবে অমন ম্যাচ যেন কোন ফুটবলারের জীবনে না আসে। একটা বালকও বুঝতে পারত ওর ওই হাসি জড়ানো কথাগুলোর মধ্যে কতটা বেদনা মেশানো।

অতঃপর সেদিন মিহির বসুর দেওয়া গোলে প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল এক গোলে এগিয়ে যাবার পর রমেনকে তুলে নেওয়া হয়, ওর জায়গায় মাঠে আসে বলাই চক্রবর্তী। এবং তারপর ও লাল-হলুদ জামা পরে আর মাঠে নামেনি। প্রথম দিকে ৭/৮ টা ম্যাচ রমেন খেলেছিল প্রত্যাশা ও সাড়া জাগিয়েই। শ্যামলের পাশে নিজেকে অনেকটা প্রতিষ্ঠাও করে ফেলেছিল, কিন্তু ৯ জুলাইয়ের ওই একটি ভুলের ধাক্কা ওর প্রত্যাশার বেলুনটাকে চুপসে দেয়। সেদিন যতদূর সম্ভব, ওই একবারের জন্য ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে বলটা যদি না পালিয়ে যেত, তাহলে লাল-হলুদ জামা এর মধ্যে হয়তো, হয়তো-ই বলেছি, রমেনের গায়ে ঝলমল করে উঠত।



রমেন ভট্টাচার্য—জর্জ রক্ষণের স্তম্ভ এবং বাংলারও / শংকর

৭৮-এ ও জর্জে চলে আসে। মাথা নীচু করে একটু ভেবে উদাস স্বরে আস্তে আস্তে রমেন বলল—আমি মানি, ম্যাচের গুরুত্ব অনুযায়ী ওই ত্রুটিটা বিরাট ছিল। তবে ওই থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোল হয়নি। আমার আজও মনে হয় একটা ত্রুটির জন্য শাস্তিটা হয়তো আমার বেশীই হয়েছে। পরমুহূর্তেই রমেনের স্বরে দৃঢ়তার স্পষ্ট ধ্বনি বেজে উঠল—তবে ভেঙ্গে আমি পড়িনি। এখনো ঠিক আছি এবং মেরুদণ্ড সোজা রেখেই মাঠে খেলি এবং রক্ষণে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। দেখা যাক, বড় টিমে আবার আমি ফিরে যেতে পারি কি না। এই শেষের কথা ক'টি বলার সময়েই রমেনকে সবচেয়ে বেশী প্রত্যয়ী মনে হচ্ছিল।

'৭৮-এ রমেন আগাগোড়া জর্জের হয়ে দুর্দান্ত খেলেছে। গতবার মোহনবাগানের সব ম্যাচে জিতে লিগ জয়ের সম্ভাবনাকে আটকে দিয়েছিল এই জর্জ টেলিগ্রাফ দলই। ওরা শেষ খেলায় রুখে দিয়েছিল মোহন-বাগানকে। এবং রমেন সেদিনও অনবদ্য খেলেছিল। এই দক্ষ ভূমিকাই '৭৮-এর শ্রীনগর ন্যাশনালে রমেনকে বাংলা দলে সুযোগ পাইয়ে দেয়। বড় দলের ছাপ গায়ে না থাকলে জাতীয় রাজ্য দলে স্থান পাওয়া অবশ্যই কঠিন কাজ। তবে ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—রমেন। জর্জ থেকে দক্ষতার জোরে বাংলা দলে জায়গা করে নেওয়াটা ওর পক্ষে নিশ্চয়ই কৃতিত্বের। '৭৭-এর কলকাতা জাতীয় ফুটবলে তপন দাস ও সুবিমল ঘোষ যথাক্রমে এরিয়ান ও জর্জ থেকে বাংলা দলে চান্স পেয়েছিল। শ্রীনগর ন্যাশনালে একটি ম্যাচেই রমেন খেলেছিল গ্রুপ লিগে নাগাল্যাণ্ডের বিপক্ষে, প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং নাসির আমেদও একটি ম্যাচেই বাংলার জার্সি পরেছিল।

'৭৯-র মরশুমে রমেনকে তিনপ্রধানই ডেকেছিল। গত বছর কথাবার্তা পাকা করেও শেষ মুহূর্তে ওকে না নেওয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে রমেন এবার মহমেডানের ডাকে সাড়া দেয়নি। আর ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানে যাবার পূর্ণ ইচ্ছে থাকলেও পা বাড়ায়নি প্রধানত একটা কারণ ঃ একই জায়গায় বেশী প্লেয়ারের ভিড়ের মাঝে ও নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়নি। দু'প্রধানের কর্মকর্তাদের কাছেই ও আবেদন রেখেছে, আমাকে তৃতীয় হাফ হিসাবে দলে নিন। তারপরের ব্যাপারটা আমার উপর নির্ভর করবে। আসলে রমেন সাইড লাইনের ধারে বসে ওর জীবনের সোনালী সময়টা নষ্ট করতে রাজী নয়। ও খেলতে চায়। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যেতে পারে, পাঞ্জাবের স্টপার গুরুদেব সিং যদি এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে যোগ না দিত, তবে রমেনের পক্ষে আবার ইস্টবেঙ্গলে ফিরে যাওয়াটা কিছুটা সহজ হত।

তা না হোক, রমেন এবছরও জর্জ টেলিগ্রাফ রক্ষণের মূল স্তম্ভ। খেলছেও দাপট বিছিয়ে। আমি ওকে আবার একটা জিজ্ঞাসার মুখে ঠেলে দিলাম—খাতায় কলমে তিন-প্রধানের ঠিক পরের শক্তিশালী দল হিসাবে বিবেচিত হয়েও জর্জের এবারের ভূমিকা এতটা নৈরাশ্যজনক কেন? ওর উত্তর ঃ গোড়ার দিকের ম্যাচগুলোতে ফরোয়ার্ড লাইন গোল পায়নি। পেলে হয়তো খেলাটা অন্যরকম হত। আর প্রথমদিকে আমাদের প্র্যাকটিসেও কিছুটা গলতি ছিল।

প্র্যাকটিসের পর সহ-খেলোয়াড়দের মাঝে রমেন / শংকর



মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে জর্জের খেলা হয়ে গেছে। অন্য ম্যাচে আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারলেও দুটো বড় টিমের বিপক্ষেই জর্জ লড়েছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রমেনকে সারা ম্যাচে দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণ আগলাতে দেখেছি। মোহনবাগান সেদিন জয় পেয়েছে দুটো সাধারণ মানের গোলে। এবং প্রথম গোলকে কেন্দ্র করে জর্জের খেলোয়াড়রা বিরাট আপত্তিও তুলেছিল। আমাদের আলোচনায় প্রসঙ্গটা উঠতে রমেন একই কথা বলল—বিশ্বজিতকে ওটা ফাউল করা হয়েছিল। মোহনবাগানকে আটকাতে না পারলেও মহমেডান ম্যাচ জর্জ বুক চিতিয়ে ড্র করেছিল। যদিও রমেন ওই ম্যাচটা খেলতে পারেনি। কারণ, সেই সময়ে ওর ফুটবল জীবনে অকস্মাৎই একটা দুর্বিপাক ছেদ টেনেছিল।

ঘটনাটা এই ঃ মহমেডান-জর্জের খেলার দিন কয়েক আগে প্র্যাকটিশের সময় একটা রবারের বেল্ট নিয়ে হাত দিয়ে টানাটানি করে ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ গোছের কিছু একটা করছিল। হঠাৎ রবারটা ছিটকে গিয়ে ওর ডান চোখে লাগে। প্রথমে রমেন ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে এবং ভাবে চোখে ড্রপ দিলেই এর সমাধান হবে। ও তাই করে এবং তার পরেও দু'দিন ওই অবস্থাতেই প্র্যাকটিশ করে যায়। তখনই এক সময় টের পায়, চোখটা ঝাপসা লাগছে। থাকে মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকে, আরপুলি লেনে। সঙ্গে সঙ্গে ও মেডিকেল-এ আসে। সেখান থেকে বলা হল—ইণ্টারনাল হ্যামারেজ হয়েছে, নার্ভ ছিঁড়ে গেছে। অতঃপর প্রায় মাসখানেক রমেন বিছানায় শুয়ে থাকে। এবং তখনই মহমেডানের সঙ্গে জর্জ খেলে। বিছানায় শুয়ে রিলে শুনতে শুনতে ও ভেবেছিল, আমি খেলতে পারলে আরও ভালো হত। প্রথম দিকে গোটা বারো ম্যাচ খেলার পর পরের আটটি খেলায় ওকে মাঠ-ছাড়া হতে হয়। জানি না, ওর এই সাময়িক অনুপস্থিতি এবারের বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটাবে কিনা।

এই লেখা যখন তৈরি হচ্ছে, তার কয়েকদিন পরেই জর্জকে লিগের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলতে হবে। তবে ইতিমধ্যে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নের উপর প্রায় যবনিকা নেমে আসার ফলে ওই ম্যাচের গুরুত্ব বেশ কিছুটা কমে গেছে। তবে রমেনের কাছে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই লেখা বেরোনোর আগে সেই ম্যাচ হয়েও গেছে।

৭৩-এ পুলিশের হয়ে প্রথম ডিভিসনে আত্মপ্রকাশের পর ৭৪ থেকে ৭৬ পর্যন্ত রমেন খিদিরপুরের হয়ে খেলে এবং এখান থেকেই ওর উত্থান ঘটে। তারপর ৭৭-এ ইস্টবেঙ্গলে গিয়ে ৭৮-এ জর্জে আসে। জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ও বাংলার হয়ে খেলে ৭৫ ও ৭৬-এ। আর জুনিয়র ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে ৭৬ ও ৭৭ সালে।

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা বেতের মত চেহারার ২৩ বছরের যুবক রমেন এ জি বেঙ্গলে চাকরি করে। ওর সামনে এখনো অনেক সময় পড়ে আছে। অশোকলাল ব্যানার্জি ওর আদর্শ খেলোয়াড় এবং যাদের খেলা কাছ থেকে দেখেছে তাদের মধ্যে ওর কাছে সবার সেরা হল সুধীর কর্মকার। এছাড়া মনোরঞ্জনের খেলাও রমেনের খুব ভালো লাগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রমেন এবং মনোরঞ্জন দু'জনে একই বছরে ইস্টবেঙ্গলে এসেছিল। ও বলল—মনা এখন নিঃসন্দেহে ইণ্ডিয়ার অন্যতম সেরা স্টপার। আমি বললাম—এই মুহূর্তে ভারতীয় দল গড়তে হলে—রমেন দ্রুত যোগ করল, ওকে বাদ দেওয়ার কোন উপায় নেই।

৭৭-এর সেই বিরাট চিৎকার, অভিনন্দন-ধ্বনি এখন ও শুনতে পায় না। এখন ওকে অধিকাংশ ম্যাচেই খেলতে হয় প্রায় খালি ও উচ্ছ্বাস-বিহীন গ্যালারির সামনে। তবু মাঠে রমেন বেশ সিরিয়াস। একটা দুর্দান্ত এক-গুঁয়েমি ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়, বড় টিমে আবার ফিরে যেতে হবেই। সেই দৃঢ় প্রত্যয় মাখা কণ্ঠে রমেন বলে—যাব যোগ্যতা দেখিয়ে, দক্ষতাকে সম্বল করেই।

পরমুহূর্তেই ও যেন কেমন উদাস হয়ে যায়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাস্তব—জানি বড় টিমে একাধিক খেলোয়াড়ের ভিড়ে জায়গা সংকুচিত হয়ে গেছে, সুযোগও অপেক্ষাকৃত কমে গেছে বড় দলে ফিরে যাওয়ার। তবু, পিছিয়ে পড়ার ছেলে আমি নই। আন্তরিকতার সঙ্গে আমার খেলা খেলে যাব, সেখানে কোন কার্পণ্য নেই, থাকবেও না ' তার পরেরটা অবশ্য নির্ভর করবে কপালের ওপর। আর একান্তই যদি বড় দলে যাওয়ার সুযোগ না ঘটে, তবে জর্জতো রইলই, তিন প্রধানের পরেই যে কোন ফুটবলারের কাছে যে দলটা অবশ্যই অন্যতম বড় মাধ্যম। জর্জের হয়েই আমার লড়াই চলবে, আর স্থির লক্ষ্য থাকবে জর্জ থেকেই বাংলা এবং ভারতের জামা গায়ে পরার—এই শেষের কথা ক'টি বলার সময় আবার লক্ষ্য করলাম, একটা কঠিন মনোবলের চিহ্ন রমেনের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।



রমেন সঙ্গে রয়েছে ডেনিস উইলিয়ামসন (দাঁড়িয়ে), অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, রতন দত্ত ও মুনীশ মান্না

ইরানের মেহমুদ খাবাজি

আসলাম খাঁ

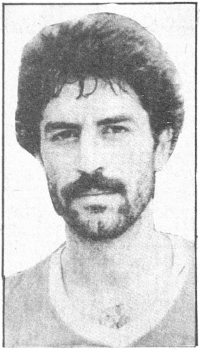
ইরান তার ওমর খৈয়াম ও হাফিজের জন্য বিশ্বখ্যাত। সারা পৃথিবীতে তার কার্পেট সমাদৃত। গতবার বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতায় গিয়ে পৃথিবীর ফুটবল প্রেমীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উত্তর কোরিয়ার পর তারাই দ্বিতীয় দেশ এশিয়া থেকে যারা এই সম্মান অর্জন করল। সেই দেশের এক তরুণকে আমরা কলকাতার মাঠে পেয়েছি। তিনি সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন এই জল-কাদার মাঠে। তার ক্রীড়া-শৈলী আমাদের মুগ্ধ করেছে। অল্প আয়াসেই তিনি বলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তার খেলার মধ্যে কাব্যিক সুষমা আছে। কেনই বা থাকবে না। মেহমুদ খাবাজির জন্ম কবি হাফিজের পূণ্য জন্মভূমি সিরাজে। সুতরাং 'একটুকু ছোঁয়া' লাগবেই।

এক ক্রীড়া উৎসাহী কার্পেট ব্যবসায়ী পরিবারে ১৯৫৬ সালে মেহমুদের জন্ম। ওরা ৬ ভাই ও ২ বোন। প্রথম ভাই ফুটবলে সিরাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একেবারে ছোট ভাই, যে হাই স্কুলের ছাত্র এবং বয়স মাত্র ১৬ বছর, জুনিয়র সিরাজ দলে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য ভাইবোনেরা ক্রীড়া উৎসাহী, কিন্তু নিয়মিত অংশ নেন না। আর মেহমুদ তো এখন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়।

এই ইরানী তরুণ মহমেডান মেসে থাকেন না। আলাদা একা থাকেন। সকালে প্র্যাকটিস ও বিকালে খেলা ছাড়া ঘর থেকে বেরোন কম। হাল্কা পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও উপন্যাস সময় কাটানোর সঙ্গী। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেন। হিন্দি ও ইংরাজী দুই-ই।

মেহমুদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্র। পড়াশুনা করার জন্যই তিনি দেশ ছেড়েছেন এবং এইটাই তার মূল উদ্দেশ্য। কলকাতায় খেলার পিছনে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, এক শখ মেটানো ছাড়া। মহমেডানের এক বিদায়ী কর্মকর্তার ছেলে তার সঙ্গে পড়ে। এই সূত্রই তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে।

জুনিয়র ও হাই স্কুল শেষ করার পর সিরাজের বিদ্যুৎ পর্ষদে ফুটবল খেলার সুবাদে তিনি চাকরি পান। এই বিদ্যুৎ পর্ষদ, বার্ঘ (Bargh), (ফার্সীতে পর্ষদের সংক্ষিপ্ত নাম) ইরানের প্রথম বিভাগে খেলে। এটা শক্তির দিক দিয়ে মাঝারী ধরনের দল। কোন সময় চ্যাম্পিয়ন হয়নি, তবে লীগ কোঠায় পঞ্চম থেকে দশমের মধ্যে থাকে। বিশ্বকাপে ইরান দলে আলি ঘাসঘাই এই দল থেকে ডিফেন্সে নির্বাচিত হন। জুনিয়র ইরান দলে স্থান পান ৫ জন। সারা ইরানে একটাই ১ম ও ২য় বিভাগ লীগ চলে। ১ম বিভাগে ষোলটা দলের মধ্যে তেহেরান থেকে ৭টা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে ৯টা। প্রত্যেক দল নিজের মাঠে একটা ও বিপক্ষ মাঠে পাল্টা ম্যাচ খেলে। লীগ শেষ হতে সময় লাগে ১০ মাস। একটা দলের দুটো ম্যাচের মধ্যে প্রায় এক সপ্তাহ সময় থাকে। এই লীগের সঙ্গে সঙ্গে একটা নক-



আউট প্রতিযোগিতাও চলে। যার স্থায়িত্ব দেড় মাস। ইরানের তাজ ও পাস ক্লাবের কথা আমরা জানি। এরা চাকরির বিনিময়ে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে। তেহেরানের পার্স পোলিস (Perspolise) টাকা দেয়। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন এদেশে যারা ৫,০০,০০০ টোমান (Toman ইরানের মুদ্রা) পান বছরে। (১ টোমান = ভারতীয় ১ টাকা ২০ পয়সা)।

ইরানে ৪-৩-৩ পদ্ধতিতে খেলা হয়। বেশীর ভাগ দলে কোচ ইউরোপীয়ান। তারা সকালে থিওরির ক্লাস নেন। বিকালে সেটা প্র্যাকটিস করান। কোচেরা শক্ত হাতে দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। তারা নিজেরা কোন সময়ই খেলোয়াড় সংগ্রহ করেন না। মেহমুদ প্র্যাকটিসে সব দৌড়ঝাঁপ বল সমেত করেন। এটা আধুনিক কোচিং-এর অঙ্গ। এর ফলে বল কন্ট্রোল অনেক সহজ হয়।

অবশ্য তিনি নিজেও ১৯৭৭ থেকে কোচিং করছেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে। গতবার ছিলেন ক্যাপ্টেন। গত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় তার দলই শুধু ৪-৩-৩, পদ্ধতিতে খেলে। আলিগড় রানার্স ও চ্যাম্পিয়ন হয় বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার বিপক্ষে মেহমুদ ৪-৪-২ রক্ষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ফল ২-২।

ইরানে দুটো যুব দল হয়। আন্তর্জাতিক ও এশিয়। প্রথম দলটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। তিনি ১৯৭৩ সালে সিরাজে আন্তর্জাতিক যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'আক্রমণাত্মক হাফ' হিসাবে স্থান পান। ওই প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ডের আরসেনাল প্রথম, মারজারস্থান (যুগোশ্লাভিয়া) দ্বিতীয়, ইরান তৃতীয় ও ভারত চতুর্থ স্থান পায়।

ইরান সরকার খেলাধূলা প্রসারে নানা ব্যবস্থা করেছেন। তারা খেলোয়াড়দের নানা সুযোগ সুবিধা দেন। সারা দেশ নানা স্টেডিয়ামে সব সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। তারমধ্যে ফুটবল প্রধান এবং তারাই সুযোগ সুবিধা বেশি পায়। ছোটরা অনেক প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়। তার ফলে স্থানীয় ক্লাবগুলোর নজরে পড়ে ও উন্নতমানের ট্রেনিং পায়। সর্বত্র ইউরোপীয় কোচের ছড়াছড়ি। তারা সব সময়ই ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। ইরানের উন্নতির এটা একটা বড় কারণ। তেহেরানের ১ লক্ষ আসনযুক্ত আরিয়ামাহের (Ariamaher) স্টেডিয়ামটি দেশের সবচেয়ে বড়। '৭৪ সালের এশিয়াড এখানে হয়েছিল।

এখানকার মেয়েরা নিয়মিত খেলাধূলা করেন। কোন সামাজিক বাধা নিষেধ নেই। তাদের সংখ্যা মোট মহিলাদের ৩০ শতাংশ। এরা অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতিতে আগ্রহী।

মেহমুদের চাকরি ছেড়ে ভারতে আসার কারণ, ৬ বছর করে জুনিয়র ও হাই স্কুলে পড়ে পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে, আসন কম থাকার জন্য, এক শক্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হয়। খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা পায় না। এদিকে আলিগড়ে সুযোগ পেলেন। ভারতে পড়তে আসলে একটা বিদেশী ভাষা (ইংরাজী) শেখা যায় না। (ইরানে লেখাপড়ার মাধ্যম ফার্সী)। এটা পরবর্তী জীবনে উন্নতির সহায়ক হয়। তাছাড়া একটা দেশকে জানার দেখার সুযোগ। এরমধ্যে তার এক সম্পর্কিত বোন আলিগড়ে চলে এলেন। (ইনিই মেহমুদের একমাত্র আত্মীয় ভারতে।) বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে তিন বছরের ছুটি নিয়ে চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা

করছেন। তারা মেহমুদকে কলকাতায় খেলার জন্য ছুটি দিয়েছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে খেলোয়াড়রা পড়াশুনা করতে পারে এবং পড়ুয়ারাও খেলাধূলো করতে পারে' বলে তিনি জানালেন।

কলকাতার মাঠে খেলার সুযোগ পেয়ে মেহমুদ খুব খুশী। তিনি এখানে অনেকদিন ধরে খেলতে চান। কোন দল সম্বন্ধে তার কোন মোহ নেই। কলকাতার মাঠে তিনি ইট ও দর্শক ঢুকে পড়া দেখে অবাক হয়েছেন। যারা মাঠে ইট ছোড়ে তার ধারণা অনুযায়ী, তাদের ফুটবল জ্ঞান কম। এরকম ঘটনা তাদের দেশের হয় না। আর দর্শক তো দূরের কথা, মাঠের মধ্যে কর্মকর্তারা পর্যন্ত ঢুকতে পারেন না ইরানে। পক্ষে বা বিপক্ষে কোন চিৎকারই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এখানকার মত ইরানের দর্শকরা কোন দল বিশেষকে সমর্থন করেন না। তারা যে দল ভাল খেলে তাদেরই সমর্থন করে।

তার মতে গতবার মোহনবাগানের বিপক্ষে মহমেডানের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসা ভুল হয়েছে। খেলার পরে অফিসিয়ালি প্রতিবাদ করা উচিত ছিল রেফারির বিরুদ্ধে। আই এফ এ ও সি আর এ কর্তৃপক্ষের উচিত বড় ম্যাচে উপযুক্ত রেফারি দেওয়া। রেফারিং নিম্নমানের ছিল। প্রথমার্ধে তাদের ন্যায্য পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে তার বিরুদ্ধে ভুল অফসাইডের নির্দেশ দিলে তিনি রেফারিকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রেফারি তখন 'এটা লাইন্সম্যানের দোষ, আমার না' বলে এড়িয়ে যান। ইরানে ইংল্যাণ্ডের এক রেফারি এই রকম নিম্নমানের খেলা পরিচালনা করার জন্য তিন বছর সাসপেণ্ড হন। ইরানের কর্তৃপক্ষ এই শাস্তির কথা এশিয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। তাদের দেশে কোন দল কোন সময় মাঠ ছেড়ে যায়নি। সুতরাং এর যে কি শাস্তি তিনি তা জানেন না। তবে একটা শাস্তি নিশ্চয় পেত। গতবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলায় দেরি সম্পর্কে সেই সময়ের সঙ্গী নঈমও কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। ১৫ মিনিট বাদে রেফারিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কলকাতা শহর সম্বন্ধে বললেন 'বড্ড ভীড়। তবে খেলাধূলার সুযোগ বেশি।'

আর 'ভারতবর্ষের মানুষরা খুব সুন্দর। ভারত কৃষি ও শিল্প দুটোতেই উন্নত। কিন্তু ভারতকে অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে তার নিজস্ব জীবনধারা।'

খেলা ছাড়ার পর তিনি ব্যবসা করতেন। কিন্তু বাবার কার্পেট ব্যবসা নয়। আপাতত ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছেন।

বাঁকুড়া ফুটবলে ঐতিহ্য হারিয়েছে

অমল ত্রিবেদী ঃ বাঁকুড়া জেলায় একটিও ভাল খেলার মাঠ নেই। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর শহরে যে দুটি স্টেডিয়াম আছে তাতে দর্শক বসার জন্য পাকা গ্যালারি আছে, কিন্তু উপযুক্তমানের মাঠ নেই।

যখন বাঁকুড়ায় স্টেডিয়াম ছিল না, ফুটবলে জেলা কোন স্বীকৃতি পায়নি তখনও বাঁকুড়ায় ফুটবল ছিল পুরোভাগে। তখন খেলার মানও এখনকার চেয়ে ভাল ছিল। বাঁকুড়া জেলার খেলাধূলার কর্ণধার নির্মল মণ্ডল জানালেন—বর্তমানে বাঁকুড়ার ছেলেরা আই এফ এ শিল্ড ও বরদলুই ট্রফির মত ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতায় খেলছে। দার্জিলিং-এর যশোদাগিরি ট্রফিতে গতবছর বাঁকুড়া দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাও বলতে বাধা নেই—বাঁকুড়ার ঐতিহ্য আজ আর বজায় নেই। এই আক্ষেপের সুর শুনলাম বাঁকুড়ার সর্বকালের সেরা ফুটবলার বাচ্চিদা ওরফে ভূষণ ব্যানার্জির কণ্ঠে। ইনি ৪০ থেকে ৬০ দশক পর্যন্ত জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবলার ছিলেন।

জেলা ফুটবলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাসবিহারী দাস সে অনেক দিন আগের কথা। তখন গোরাদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলেরা সমানতালে মোকাবিলা করত। আবদুল ওয়াদুদ, অমূল্য কুণ্ডু, রাখহরি চ্যাটার্জি, ভবানী মিত্র, নারায়ণ সিকদার, গোলকিপার রেবতীবাবু এরা সকলে মিলে বাঁকুড়াকে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করলেন। তখনকার শক্তিশালী দল ছিল—টাউন ক্লাব, ওপন ক্লাব, ক্রীশ্চান ডাঙ্গা কলেজ দল ও মেডিক্যাল স্কুল। জেলার প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা সরস্বতী শিল্ডের খেলা ৪২/৪৩ সালে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে নন্দ শিল্ডের খেলা হচ্ছে বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে। খেলতে আসে দূরদূরান্তের বহু সেরা দল। লিগের প্রথম ডিভিসনে খেলে ১২টি ও দ্বিতীয় ডিভিসনে ১৪টি দল। শহরের উল্লেখযোগ্য দলগুলি হল—প্লেয়ার্স কর্নার, ডি ও সি, পুলিস, মৌসুমী, অরূপ ক্রীড়া সংস্থা ও মেডিক্যাল কলেজ।

বিষ্ণুপুর মহকুমা শহরে ফুটবলই জনপ্রিয় খেলা। এখানকার বি এস এ স্টেডিয়াম অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। বিষ্ণুপুর ক্রীড়া সংস্থা এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। জেলার ছাতনা, সোনামুখী, খাতরা, সানবাঁধা, ওন্দা প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ছোটোখাটো আসর বসে। রানীবাঁধে আদিবাসীরা একটি ফুটবল আসর পরিচালনা করে। এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে আদিবাসীরা উৎসব সাজে সজ্জিত হয়ে দলে দলে মাঠে এসে ভিড় করে।

জেলার বহু খেলোয়াড় নিয়মিত কলকাতার মাঠে খেলেছেন, অনেকে এখনো খেলছেন। এরিয়ানের ব্রজেন মুখার্জির নাম এখনো অনেকের মুখে মুখে ঘোরে। কমল মুখার্জি, ইন্দ্র সামন্ত, মোহিত ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুপুরের অনিল বোস, ফটিক চন্দ্র মোদক ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। বর্তমানে উদয় দাস ও জয়ন্ত মুখার্জি কলকাতা লিগে খেলছেন। আশিস রায়, পার্থ সামন্ত, তাপস চক্রবর্তী, নীহারেন্দু দত্ত, স্বপন দে বর্তমানে ভাল খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাল খেলছে জয়ন্ত মাইতি, কমল ঘোষ, উদয় সরকার, মিলন ঘোষ, শুভঙ্কর বসু, অসীম দিকপতি ও পুলকেশ নিয়োগী। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু এদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য ডি এস এ'র ভূমিকা কতটুকু? সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা-নামেই জেলার খেলাধূলার কর্ণধার বাঁকুড়া ফুটবলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। জেলায় কোচ নেই, ভাল মাঠ নেই, তরুণ ফুটবলারদের সামনে রঙীন ভবিষ্যতের কোন হাতছানি নেই। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের চোখে বাঁকুড়া ঠিক সেই রূপকথার দুয়োরানী!

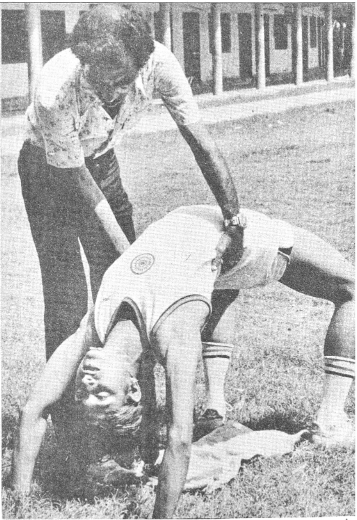
পুরুলিয়ায় সাব-জুনিয়র ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে পুরুলিয়া হিলভিউ গ্রাউণ্ডে প্রথম হল সঞ্জীব-সব্যসাচী সাব-জুনিয়র ফুটবল। নডিহা জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বি এফ সি, আগুয়ান, শক্তি সংঘ, মনোরঞ্জন, আমডিহা তরুণ ফুটবল ক্লাব, কেতিকা ফুটবল ক্লাব প্রভৃতি দলগুলি। ৮ আগস্ট এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমডিহা তরুণ ফুটবল ক্লাব কেতিকা ফুটবল ক্লাবকে পরিষ্কার ৩-০ গোলে পরাজিত করে সঞ্জীব স্মৃতি শিল্ড জয় করে নেয়। আমডিহার পক্ষে গোল করে পার্থপ্রতিম কর দুটি ও সন্দীপ চ্যাটার্জি। পার্থপ্রতিম প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা। সে একটি ডবল হ্যাটট্রিক সহ তিনটি হ্যাটট্রিক করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতা নতুন ফুটবল প্রতিভার সন্ধান দেবে, যার ফলে পুরুলিয়া ফুটবল আরও সমৃদ্ধ হবে—এই আশা ব্যক্ত করলেন নডিহা জিমন্যাস্টিকের সাধারণ সম্পাদক শোভন শূর রায়।





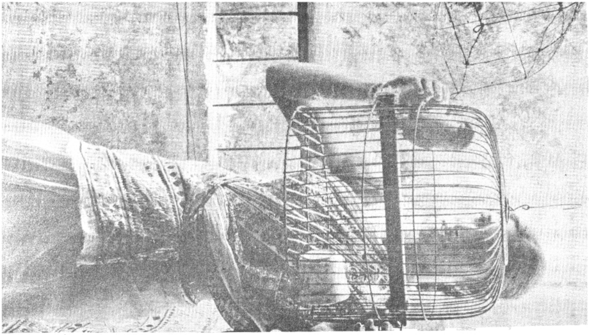




রীতা—আদর্শ গৃহিণী

রীতা সেন। গৃহস্থ বধূ। '৭৫ সালে জুলাই মাসে বিয়ে হয় আশিস সেনের সঙ্গে। আশিস সেন রীতার কোচও বটে। বাড়িতে ৮ বছরের ঝুম্পি (সুমিতা) মা রীতাকে ভালবাসে খুব। মাঝে মাঝে মাকালীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রার্থনা করে, 'ঠাকুর মাকে ফার্স্ট করে দিও।'

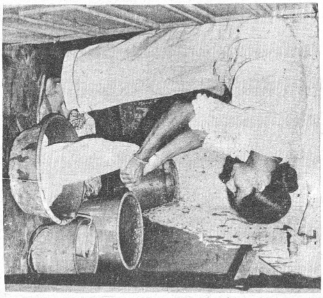
রীতার হবি গান শোনা। গান শুনতে শুনতে স্বামীর সঙ্গে তাস খেলে, সাময়িকীর পাতা উল্টোয়। বাড়িতে পোষা পাখী, ঘরকন্যার কাজ, মেয়েকে পড়ানোয় সাহায্য করা, মাঝে মাঝে তাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া সবই করতে হয়। বাড়িতে কেউ এলে আদর আপ্যায়ন সেও তো গৃহস্থ বধূর দায়িত্ব। তারপর রয়েছে নিজের অফিস (এফ সি আই—স্পোর্টস সেকসন)। মাঝে মাঝে হিন্দী সিনেমা দেখতে যান, ভাল লাগে। বাগান করতেও ভাল লাগে, খাদ্য হিসেবে প্রিয়,মিষ্টি। কিন্তু সবার উপরে অবশ্যই রীতার প্রথম কাজ খুব ভোরে উঠে রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে নিয়মিত প্র্যাকটিস করা। এবং সেখানে অবশ্যই স্বামী আশীষই প্রধান সহায়। অ্যাথলেট রীতা কিন্তু প্র্যাকটিস ও প্রতিযোগিতার বাইরে আদর্শ গৃহিণী।





ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী







পঁচিশ বছরে এইচ এম আই-তে একজনও বাঙালী প্রশিক্ষক নেই

অজয় বিশ্বাস : 'রায়-ভিলা' থেকে জওহর পর্বতে আসার পর এইচ এম আই-তে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে জ্যামিতিক হারে। প্রশিক্ষণলাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার তালিকায় নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করতে হয় হামেশাই। শুধু এদেশ নয়, বিদেশ থেকেও এরা আসছেন দলে দলে। বর্মা, নেপাল, ভুটান, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, সিংহল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্ত থেকেই শিক্ষার্থীরা আসছেন প্রতি বছর। শিক্ষার্থী সংখ্যার বৃদ্ধিই যদি সাফল্যের নিরিখ হয়, তাহলে এই ক্রম-বর্ধমান হার নিঃসন্দেহে মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউটের সার্থকতার দর্পণ।

[illegible] সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব দিয়ে সরকারিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের বিচার আর আদর্শ এবং লক্ষ্যের মূল চেতনার গতি অব্যাহত রাখা, এ দুয়ের মধ্যে ফারাক আসমান-জমিন। 'মাউন্টেনিয়ারিং' বিষয়টির সঙ্গে অন্যান্য অ্যাকাডেমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌল পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধ। শুধুমাত্র আংকিক হিসেব-নিকেশের পদ্ধতিতে যার গভীরতার পরিমাপ সম্ভব নয়। এখানে হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসার ব্যাপারটিও জড়িয়ে আছে অনেকখানি। ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। যে আবেগ, যে গভীর-বোধ নিয়ে তেনজিং বলেন : ইট ইজ সেকরেড। ইট ইজ ইটারনাল পিলগ্রিমেজ।'

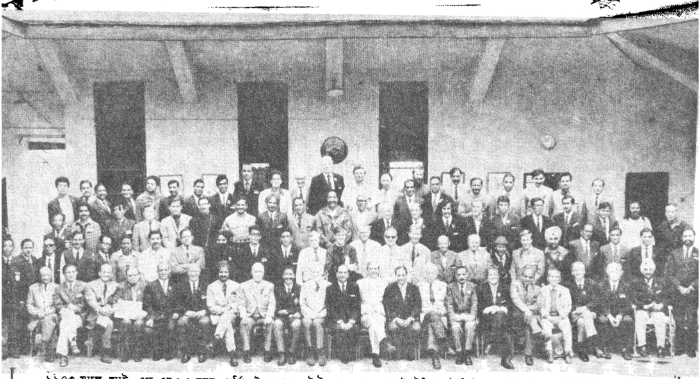
'রায়-ভিলা'র ছোট্ট বাড়ির স্বল্প পরিসরে কাটানো দিনগুলিতে নবীন এইচ এম আই-এ অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই বোধ, এই আদর্শ ছিল সযত্ন লালিত। পাহাড়ে চড়ার চাইতেও পাহাড়কে ভালোবাসার, শ্রদ্ধার আসনে বসানো। এই পাঠ, এই বোধ গেঁথে দেওয়া হত নবীন শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে। দেবাত্মা হিমালয়ের [illegible] আত্মার [illegible] নিবিড় আত্মীয়তার রাখী বন্ধন ছিল সেদিনের মাউন্টেনিয়ারিংয়ের মূল কথা।

কিন্তু আদর্শ থেকে সরে [illegible] কিংবা [illegible]লক্ষ্যের ডামাডোলের ভিড়ে লক্ষ্যের কক্ষ-চ্যুত হওয়াটা আমাদের দেশে একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। হিমালয়ের শান্ত সমাহিত পরিবেশে থেকেও মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউটের পক্ষেও সেই গড্ডলিকা প্রবাহের ছোঁয়াচ মুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। যে মানসিক দীনতা আমাদের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আদর্শচ্যুত করেছে, সেই বিষ-বাষ্প এইচ এম আই-তেও সংক্রামিত। বাতাস এখানেও ভারী।

এইচ এম আই-এর জন্ম লগ্ন থেকেই প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ পরিচালনার কেন্দ্রীয় অর্থের বরাদ্দ আসে প্রতিরক্ষা খাত থেকে। শুরুতে যা গাঁটছড়া মাত্র ছিল, পরবর্তীকালে তা কার্যত প্রতিরক্ষা বিভাগেরই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীর নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি সদগুণ যদি ইনস্টিটিউটের কাজে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হত তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু কার্যত ঘটেছে এর বিপরীতটাই।

প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে মেজর জয়াল যে পাঠক্রম এবং পাঠধারা ইনস্টিটিউটে চালু করতে সচেষ্ট ছিলেন তার মূল কথা : পাহাড়কে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার বোধ [illegible] মনে আরও গভীরভাবে গেঁথে দিতে [illegible] থেকে পাহাড়ে নিত্য অভিযানে সক্রিয় সঙ্গী হতেন তিনি। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন হিমালয়ের বিপুলা প্রকৃতির বৃক্ষ-লতা, পত্র-পুষ্পের, বিভিন্ন উচ্চতার, প্রাণীজগৎ, কীটপতঙ্গ আর জন জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে। তার এক ছাত্রের ভাষায় : নন্দু জয়ালের সঙ্গে কাটানো সেই ক্যাম্প জীবনের কথা ভুলবো না। তার মত হিমালয়-প্রেমিক শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে হিমালয়ের অন্তর সত্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটতো না কোনদিন।

সে সময়ে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের পুরো



১৯৭৩ সালে আই এফ-এর ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেনিয়ার্স মিট। অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি জাপান, নেপাল, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে ৭৫ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন

ব্যাপারটাই ছিল উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ভরা। কখনও জোংরি, কখনও কাংপিক নতুন নতুন পথে অভিযান হত। কত স্পেসিমেন কালেকশন হত। সেই সব সংগৃহীত দুর্লভ স্পেসিমেনে আমার মিউজিয়মও ভরে উঠতো। তার থেকেই পরবর্তী শিক্ষার্থীদেরও জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠতো। আর এই স্পেসিমেন কালেকসন ছিল পাঠক্রমেরই অঙ্গের মত। কিন্তু আজকাল সবই কেমন যেন প্রাণহীন যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। হিমালয়কে জানবার, ভালোবাসার, শ্রদ্ধা বাড়বার অবকাশ সেখানে কোথায়? আজ যা হচ্ছে, তাকে আর যাই বলা যাক প্রকৃত অর্থে মাউন্টেনিয়ারিং বলতে আমার মন সায় দেয় না। একদা পাহাড়-পাগল মণি সেন রোগ শয্যায় শুয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। অতীতের বর্ণাঢ্য দিনগুলির পাশে আজকের অবক্ষয়ী অন্ধকারের বিষণ্ণ আলাপচারী।

'রায়-ভিলা'র প্রথম উৎসাহ উদ্দীপনার দিন, পর্বত প্রমান আন্তরিকতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনে জীবন যোগ করে হিমালয় সচেতনতার গভীরবোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করার 'পুরস্কার' মেজর জয়াল পেয়েছিলেন জওহর পর্বতে এসে। আমাদের ট্র্যাডিশনাল উপেক্ষা এবং প্রতিবন্ধকতার যুগপৎ আক্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয় তার শেষের সেই বেদনাবহ দিনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৫৮-তে ভারতীয় পর্বত সংস্থার (IMF) প্রতিষ্ঠার পর ইনস্টিটিউটের উপর দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বেড়ি আরও চেপে বসে। এই সময় প্রকৃত হিমালয় বোদ্ধা নন্দু জয়ালের সঙ্গে কেতাবী পর্বত বিশেষজ্ঞ অমলাতন্ত্রের সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবার আগেই অভিমানী মন নিয়ে জীবনের চরম অভিযাত্রা সম্পূর্ণ করে তিনি চলে যান সব সংঘাতের, সব তিক্ততার, সব নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সেই শুরু। গঠনতন্ত্রের রন্ধ্র পথে দিল্লির আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল একেবারে গোড়াতেই। সেই বিষ বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করে দ্রুতগতিতে। অধ্যক্ষের নির্বাচন থেকে পাঠক্রমের অবিজ্ঞজনোচিত সংকোচনের শুরু হয়! দিল্লির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নির্ধারিত হয় তুষার মৌলী অপরূপা হিমালয়ের বুকে পর্বতারোহণ নামক ব্যাপকতর, ভিন্নতর এক শিক্ষা পাঠক্রমের ভাগ্য। পাহাড়কে ভালোবাসার পাগলামী নয়, মাউন্টেনিয়ারিং নামক জটিলতর পদ্ধতির অধ্যয়ন! আন্তর উপলব্ধির বিকাশ ভাবনার ক্ষীর শূন্য নীড়েই হাত পা ছোড়ার আত্ম প্রতারণা। পর্বত অভিযানমূলক স্নাতক পাঠক্রম থেকে 'অভিযান' নামক রহস্য-রোমাঞ্চে ঘেরা শব্দটির পরি-



ডাইরেক্টর ফিল্ড ট্রেনিং নওয়াঙ গম্বু

কল্পিত নির্বাসন!

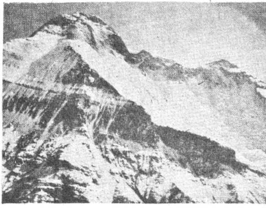
১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে এইচ এম আই কার্যত প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি শাখা ইউনিটে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং অনুমোদনের জন্যে সুদূর দিল্লির মুখাপেক্ষী হওয়াটা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর এদেশে 'ফাইল' নামক বস্তুটির রহস্যময় গতির সঙ্গে আমাদের সকলেরই তো অল্প বিস্তর পরিচয় আছে। আর এই 'ফাইল' অভিযানের সার্থক পরিণতির জন্যে স্বজনপোষণ ও তৈলমর্দনের উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কাছে পাহাড় চেনা কিংবা তাকে ভালোবাসার গুণাবলী একান্তই গৌণ। এই সব তথাকথিত পাহাড় বিলাসীদের শৌখিন পর্বত অভিযানের ধাক্কায় মূল উদ্দেশ্যেরই প্রায় সমাধি ঘটে গেছে!

কিন্তু এসবের জন্যে সবটুকু দায়ভাগ দিল্লির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়াটা নেহাতই একতরফা হবে। কারণ আঠারো সদস্যের পরিচালকমণ্ডলীর সহসভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং দু'জন সেক্রেটারির একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরেরও সেক্রেটারি। কিন্তু তাদের সবটুকু কর্তব্য বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিতির মধ্যেই সীমিত। পশ্চিমবঙ্গেরই একটি জেলা শহরে ভারতীয় পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের মক্কা নামে অভিহিত এইচ এম আই-এর মত একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান আছে এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ধারালো নয়। এই নির্বিকার ঔদাসীন্যের সুযোগে দিল্লির হাতের মুঠোই কেবল শক্ত হয়েছে। এই বিরাট কর্মকাণ্ড যা সমষ্টিমুখীন হতে পারতো তা অপর সেক্রেটারির এক চেটিয়া আধিপত্যের কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছে। অধুনা অবসর প্রাপ্ত এই রিটায়ার্ড আই সি এস অফিসারের ভালোলাগা না লাগার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে।

ভাবতে খারাপ লাগলেও একথা সত্য যে সমাবর্তন উৎসবের তেনজিংয়ের অনুপস্থিতি কিংবা মণি সেনের প্রতি আশ্চর্য অনীহার অনেকখানি রহস্যই এখানেই নিহীত। পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকের দায়িত্বে একজনও বাঙালী মুখের দেখা মেলেনি এই পঁচিশ বছরে। যদিও শিক্ষার্থীর সংখ্যায় এবং ভারতীয় পর্বতারোহণ আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ পুরোধা শরিক। প্রশিক্ষণের কাজে বাংলার অভিযাত্রীদের নৈপুণ্য যে অনস্বীকার্য বিশেষ আমন্ত্রিত প্রশিক্ষকের তালিকার দিকে চোখ ফেরালেই তা স্পষ্ট। তবু দুধের বদলে এই ঘোল দিয়ে ভোলানোর প্রয়াস কেন, এ জিজ্ঞাসা অসঙ্গত নয় নিশ্চয়ই।

তবু এই আঁধারেও আশার রূপোলী আভাস মিললো ইনস্টিটিউটের প্রথম বাঙালী অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে চৌধুরীর এবং ডাইরেক্টর ফিল্ড ট্রেনিং নওয়াঙ গম্বুর কথায়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন চৌধুরী ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার নিয়েই এই চিরাচরিত অচলায়তনের বন্ধ দুয়ার খোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন। পর্বত অভিযাত্রী হিসেবেও তার অতীতগৌরব দীপ্ত (অবশ্য জয়াল পরবর্তী এইচ এম আই অধ্যক্ষেরা সকলেই এভারেস্টিয়ার): ১৯৫৭-তে নন্দাদেবী, '৫৯-এ চৌখাম্বা (২৩, ৪২০ফুট) ১৯৬০ এবং '৬২-তে আই এম এফ পরিচালিত এভারেস্ট অভিযান, '৬১-তে নীলকান্ত (২১, ৬৪০ ফুট) এবং '৬৪ পাঞ্চুলী (২২, ৬০০ ফুট) পঞ্চশিখর অভিযানের নেতৃত্বের

নন্দাদেবী—পৃথিবীর বৃহত্তম বাইশটি আবিষ্কৃত পর্বত চূড়ার একটি





তেনজিং নরগে

অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আছে তার পুঁজিতে।

মাউন্টেনিয়ারিং নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এদেশে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ভবিষ্যতও অত্যন্ত উজ্জ্বল। উত্তরকাশী এবং নৈনিতাল ছাড়াও চতুর্থ আরও একটি ইনস্টিটিউট খোলারও প্রস্তাব আছে জম্মু-কাশ্মীরে।

এইচএম আইতে বসে কথা হচ্ছিল অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন চৌধুরীর সঙ্গে। পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন: ছোট ছোট ক্লাবগুলিকে এইচ এম আই থেকে অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অ্যাডভেঞ্চার কোর্সের ক্ষেত্রে আউটডোর অ্যাকটিভিটিসের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। অ্যাডভান্স কোর্সের ট্রেনিদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের অভিযান কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের অভিযাত্রী মানসিকতার বিকাশ দ্রুততর হবে।

ইনস্টিটিউটের বর্তমান ডাইরেক্টর ফিল্ড ট্রেনিং, দু'বার এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণকারী একমাত্র ব্যক্তিত্ব, নওয়াঙ গম্বুও আশাবাদী ভারতে পর্বতারোহণের আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে: ভারতে পর্বতারোহণের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমাদের এই ইনস্টিটিউটেই প্রতিবছর যেভাবে ভর্তির জন্যে 'কিউ' পড়ছে তাতে এ বিষয়ে আগ্রহ যে ব্যাপকভবে বাড়ছে তা অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রতিবছরই বহু স্টুডেণ্টকেই হতাশ করতে হয়।

আজকাল মাউণ্টেনিয়ারিং টেকনিকের অনেক উন্নতি হয়েছে, সেই আধুনিক পদ্ধতি আমরা এখানেও প্রয়োগ করছি। ১৯৭২ সালে আমেরিকা থেকে এ বিষয়ে আমি প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি। ১৯৭৩ সালে আই এম এফ-র ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে ইণ্টারন্যাশনাল মাউণ্টেনিয়াসে মিট হয়েছিল সে সময়ও মাউণ্টেনিয়ারিংয়ের মডার্ন টেকনিক নিয়ে কাশ্মীরেও একটা ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছিল।

পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাতে শ্রীগম্বু অত্যন্ত আশাবাদী। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা বললেন।

১৯৬৪-র এপ্রিলে এইচ এম আই-তে প্রথম লেডিস কোর্স চালু হয়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে পশ্চিমবাংলাই শীর্ষে। ১৯৮৪ সালে মেয়েদের নিয়ে একটা এভারেস্ট এক্সপিডেশনেরও পরিকল্পনা আমাদের আছে।

'রায়-ভিলা' থেকে জওহর পর্বতে আসবার পর দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। বহু নতুন অভিযাত্রা আর বহু নবীন অভিযাত্রীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়েছে হিমালয়ের পথে-প্রান্তরে। হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পৌঁছে গিয়েছে রজত জয়ন্তীর বর্ষে। অনেক আশা, অনেক হতাশার অন্ধকারও জমা হয়েছে এইচ এম আই-এর আনাচে-কানাচে। জমেছে অনেক ঔদাসীন্যের বরফ। রমণীয় কমপ্লেক্স, সাজানো মিউজিয়াম কিংবা জয়াল হলে বসে ১৯৬৫-র সেই 'এভারেস্ট এক্সপিডেশন' ফিল্ম



এইচ এম আই-এর মূল মিউজিয়াম

দেখতে দেখতে আমরা ভাবি না কোন দিনই, পাহাড়ে চড়া শেখার এমন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পাহাড় পাগলরা নির্বাসিত হচ্ছেন ক্রমশ, সে ভাবনাও দের ব্যথিত করে না।

এইচ এম আই-এ ঢুকতেই চোখে পড়ে রিলিফ মডেলের শীর্ষে লেখা আদর্শ বাণী: সানো: সানু মারুহত্। ইউ (মে) ক্লাইম্ব পিক টু পিক।' সে আর কবে পূর্ণ হবে?

মেজর এন ডি জয়াল: এইচ এম আই'র অগ্রপথিক

এইচ এম আই'র প্রথম অধ্যক্ষ মেজর নন্দু জয়াল হিমালয়ের সঙ্গে বেঁধেছিলেন গভীর আত্মীয়তার রাখী। হিমালয়ের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ গড়ে উঠেছিল ছেলেবেলা থেকেই। কিশোর নন্দু থেকে মেজর নন্দু জয়াল—পর্বত অভিযাত্রার এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় পর্বতারোহণের অবিস্মরণীয় নাম!

১৯৪২: ১৬ বছরের কিশোর নন্দু ১৯০০০ ফুট আরওয়া উপত্যকার হিমবাহে আরোহণ করেন।

১৯৪৬: জ্যাক গিবসনের বান্দার-পাঞ্চ অভিযানে তেনজিংয়ের সঙ্গে ১৯,৪০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন।

১৯৪৯: সামরিক বাহিনীর স্কি স্কুলের প্রধান নির্দেশক নিযুক্ত হন।

১৯৫১: নন্দা দেবীর ফরাসী অভিযাত্রী দলের সংযোগরক্ষাকারী হিসেবে ২২০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন।

১৯৫২: কামেট অভিযান (বেঙ্গল স্যাপার)

১৯৫৩: নেতা কামেট অভিযান। এবং ২৪,১৩০ ফুট আবি গামিন আরোহণ করেন। ১৭ জুন।

১৯৫৪: এইচ এম আই'র প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান।

১৯৫৫: এইচ এম আই ও বেঙ্গল স্যাপারসের যৌথ অভিযানের সার্থক নেতা হিসেবে কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) আরোহণ। ৬ জুলাই।

১৯৫৬: কারাকোরাম পর্বত শ্রেণীর সাকাংগ (২৪০০০ ফুট) শৃঙ্গ আরোহণ করেন প্রথম অভিযাত্রী হিসেবে। ২৫ জুলাই।

১৯৫৭: এইচ এম আই'র উচ্চতর পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের নেতা হিসেবে নন্দা দেবী (২৫,৬৪৫ ফুট) অভিযান পরিচালনা করেন।

১৯৫৮: নেপালের চো-উ (২৬,৭৫০ ফুট) অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী বেস ক্যাম্প থেকে ১নং ক্যাম্পে পৌঁছে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জীবনের অভিযাত্রারও শেষ করেন।

অন্যচোখে



ব্যাসদেব : ফুটবল লিগ আর মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে যে শুধু কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত আর ভারতের বাইরের লোকেরাও মাথা ঘামাচ্ছে—কে জানত সেকথাটা। অথচ চিঠিপত্তরের তাড়া হাতড়াতে গিয়ে সে তথ্যটাই আবিষ্কার করলাম।

আর্জেণ্টিনার ফুটবলার মারিও কেম্পেস লিখেছেন, তোমাদের ওখানে লিগের খেলা তো শেষ হয়ে এল শুনছি! মোহনবাগানই নাকি চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে আবার? বছরের পর বছর নাকি হয় মোহনবাগান না হলে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়? আচ্ছা ওই দুটো দল থেকে প্লেয়ার নিয়ে বাইরে খেলতে গিয়েও ইণ্ডিয়া পস্তায় কেন বলতে পার?

লিওপোল্ড লুকেও একটা চিঠি দিয়েছে সঙ্গে। 'ওয়ার্ল্ড কাপের' সময় কলকাতার কাগজগুলোতে আমার যত ছবি ছাপা হয়েছে পৃথিবীর আর কোথাও তা হয়েছে শুনিনি। আচ্ছা তোমাদের ওখানে তো শুনি লিগ খেলা নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ হয়। এখানকার কাগজগুলোতে তোমাদের সুপার স্টারদের ছবি দেয়না কেন বুঝতে পারিনা। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে আমার।

হল্যাণ্ডের নিসকেনস দারুণ দুঃখ করেছে বিগ ম্যাচ ড্র হয়ে গেছে শুনে। লিখেছে, ওই খেলাটার জন্যেই নাকি যত হৈ চৈ। লিগ চ্যাম্পিয়নও হয় ওই খেলাটা থেকে। তবে এতদিন ধরে মিছিমিছি লিগ খেলা হয় কেন? একদিনেই লিগ শুরু আর শেষ করে দিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে পারতে তোমরা।

ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেলেও গাভাসকার ভোলেনি কলকাতার ফুটবল লিগকে। ওর চিঠি পড়লাম, আমরা যে টেস্ট খেলছি আর তা নিয়ে তোমরা যে বেশী মাতামাতি করছ না তা বুঝতে পারছি কলকাতা থেকে আসা কাগজগুলো দেখে। এখানকার কাগজগুলো তো পাত্তাই দিচ্ছে না আমাদের। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে একশ রানের কমে ইনিংস শেষ হবার পর বলতে কি আঁতকে উঠেছিলুম। চুয়াত্তরের সফরেও এখানে মোটে ৪২ রান করেছিলুম একবার। একটা কাগজে তাই দেখে কার্টুন বেরিয়েছিল স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, কেন বাথরুমে গেলে? ইণ্ডিয়ার ইনিংসটা দেখতে পেলে না?

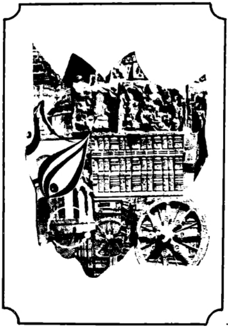
এবারও সেরকম কিছু হবে ভেবেছিলাম। তবে হয়নি। কিন্তু একজন লিখেছে, বিচ্ছিরি একটা দলকে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে ইণ্ডিয়া বলে চালানো হচ্ছে। ওরা তো জানে না কলকাতায় ফুটবল নিয়ে যতই হৈ হৈ হোক, ইণ্ডিয়া বাইরে খেলতে গেলে লোকে আরও যা তা বলে। যাক, দেশে ফিরতে দেরী আছে তো আমাদের, কে লিগ পেল জানিও।

বারো বছর পশ্চিম জার্মানির কোচ হয়ে থাকা হেলমুট শোন জানতে চেয়েছেন—কলকাতায় ফুটবল লিগ খেলে যারা তেমন কারো কোচের দরকার আছে কিনা। যেরকম শুনছি, কলকাতায় নাকি পুরনো প্লেয়ার হলেই কোচ হওয়া যায়। কোচিং কিছু শেখা থাক আর না থাক। আমি তো সত্তরে পশ্চিম জার্মানিকে সেমিফাইনালে, আর চুয়াত্তরে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে দিয়েছি ওয়ার্ল্ড কাপে। এই বয়সে আর বেশী খাটতে চাইনা। কলকাতায় কোনো ক্লাবের ভার পেলে রাজী আছি। শুধু টিকে থাকার কসরৎটুকু জানলেই হল।

ফিফার প্রেসিডেন্ট দুঃখ করছেন—আই এফ এ'র প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি বলে। লিখেছেন, কি দারুণ সিস্টেমে লিগ খেল তোমরা। ওপরের দুটো দল চ্যাম্পিয়ান হবার জন্য লড়ে যায়। তলার কয়েকটা দল যাতে নেমে যেতে না হয় সেদিকটাই দেখে। আর মধ্যিখানের দলগুলো দুটোর কোনটাই করে না। একটা লিগে তিনরকম দলের তিনটে উদ্দেশ্য। এত সার্প ব্রেন নিয়েও কেন যে তোমরা ফুটবলেই শুধু 'তা' লাগিয়ে রেখেছ, আজও বুঝে উঠতে পারিনি আমি।

● কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ তখন দারুণ জমজমাট। দু হাতে পয়সা লুটছে ইংরাজ কুঠিয়াল আর শেঠ-বেনিয়ার দল। নবাবের জন্মদিনে পথে-ঘাটে আতরই ঢালা হল বারো লাখ টাকার। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনে প্রেম-প্রতিহিংসা, চাওয়া-পাওয়ার নিত্যলীলা।.......বাংলার ইতিহাসের ব্রাত্যজনদের নিয়ে **অসীম রায়ের** এপিক উপন্যাস—**পলাশী কতদূর।** তথাকথিত শারদীয় উপন্যাস নয়; অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন-মথিত সুবিশাল স্বাদু কাহিনী। সযত্নে সংগ্রহ করে রাখার মত লেখা।

● দারুণ অ্যানটি-বাঙাল পরিবারের ছেলে মন দিয়ে ফেলেছে কট্টর বাঙাল ঘরের মেয়েকে। কর্তারা অনেক তর্জন-গর্জন করেও তাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারলেন না। শেষমেষ ঝামেলা বাঁধল অন্য জায়গায়—বিয়েটা হবে কোন মতে? তত্ত্ব ছাড়া ঘটি অচল; বাঙালেরা তালাশের কাঙাল। কী ঘটল শেষে? **নিবারণ চক্রবর্তীর** বিস্ফোরক লেখা—**ঘটি বাঙালের বিয়ে।**



শারদীয়া
পরিবর্তন
১৩৮৬

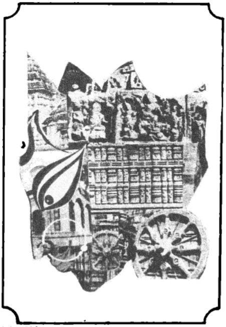
● সুধীর চক্রবর্তীর কলমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুই সম্রাজ্ঞী কণিকা আর সুচিত্রার অন্তরঙ্গ আলেখ্য: কার কাছে ওরা গান শিখেছেন, কোন গান ওদের বেশি প্রিয়, রেডিও-টিভি-জলসা—কার কোনটা পছন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কী, ওদের যোগ্য উত্তরাধিকারী কে, ওরা কি অবসর নেবার কথা ভাবে ?

● ম্যাজিক করে ছেলে উচ্ছন্নে গেল—এই দুঃখ সারা জীবন বয়ে গেছেন পি সি সরকার সিনিয়রের বাবা। কিন্তু নিজে ম্যাজিসিয়ান হয়েও পি সি সরকার জুনিয়রের বাবা কি নিজে তাকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলেন? অসাধারণ আত্মজৈবনিক লেখা।

● দেবাসনময় পূর্ব ভারতের মন্দির-সংস্কৃতির এক সুচয়িত আলেখ্য। দক্ষিণেশ্বর, কামরূপ, চিত্রেশ্বরী, তারাপীঠ, হংসেশ্বরী—অতীত ও বর্তমান, কিংবদন্তী ও ইতিহাস, ভক্তি ও স্বার্থ-সিদ্ধির আকর্ষণীয় কথাচিত্র। অসংখ্য ছবি।

● ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উৎসবের চিত্ররূপময় বিবরণ। দক্ষিণ ভারতের 'পোঙ্গল', ওড়িশার 'রজঃ', আসামের 'রঙ্গালী বিহু', বিহারের 'ঈদ', মুসলমানী পরব 'ঈদ-উল-ফিতর', সিকিমের বৌদ্ধ উৎসব 'পদ্মসম্ভব'।

● একগুচ্ছ বাছাই-করা ছোটগল্প। দমফাটা হাসির গল্প ● হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, তেলেগু কবিতার অনুবাদ ● উপজাতি-জনজীবন ● গিরিশ কারনাডের একটি অনন্য প্রোফাইল।



পরিবর্তন
মানেই অন্য রকম

দাম মাত্র ছ টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী। কলকাতা-৭২

মস্কো —'৮০ঃ পরিবহণে ও পথ নিরাপত্তায় টি ভি ও কম্প্যুটার

অতীন সরকার

ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে থেকেই প্রতিটি ওলিম্পিক নগরীতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও ক্রীড়ানুরাগীর সমাবেশ হয়ে থাকে। ক্রীড়া-পাগল সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিতব্য ২২তম মস্কো ওলিম্পিকে আরও বেশী সংখ্যক দর্শক ও পর্যটক সমবেত হবেন এটা ধরে নেওয়া যায়। শুধু যাত্রী পরিবহণই নয় নানা ধরনের পণ্য, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বহু ধরনের দ্রব্যই তখন বহন করতে হবে। এই সঙ্গে দর্শনীয় স্থানে, থিয়েটার-সিনেমা হলে দর্শক কম হবে না।

প্রাথমিকভাবে হিসাব করে দেখা গেছে ওই সময় ৩ কোটি ১০ লক্ষ যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। এই সংখ্যা মস্কোর নিয়মিত যাত্রীর থেকে শতকরা ২০ ভাগ বেশী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দশম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৬-৮০) অনুসারে মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য ১৬৫ কিমি থেকে বেড়ে ১৮৫ কিমি হচ্ছে। ট্রলি বাস রুট ৪৪৫ থেকে ৫৫৫ কিমি ও বাস রুট ১২৩০ থেকে ১৩৪০ কিলোমিটার বাড়ান হচ্ছে।

এই সমগ্র অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য ওলিম্পিক সংগঠন কমিটি, পৌর পরিবহণ প্রশাসন এবং মস্কো মাস্টার প্ল্যান রিসার্চ ও ডিজাইন ইনস্টিট্যুট যুক্তভাবে পরিকল্পনা মতো কাজ করছে।

ঠিক প্রতিযোগিতা শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে প্রতিযোগী ও দর্শকদের ক্রীড়া কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য বড় রাস্তা বিশেষ করে সংরক্ষিত থাকবে ওলিম্পিক যাত্রীদের জন্য। সব ধরনের ট্র্যাক, এবং ওলিম্পিক কেন্দ্রে যাবে না এমন বাসগুলিকে সমান্তরাল অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। মস্কো শহরে ওলিম্পিক কেন্দ্রগুলি হল—লেনিন সেণ্ট্রাল স্টেডিয়াম, ডায়নামো স্টেডিয়াম ও নবনির্মিত প্রোস্পেক্ট-মিরা ইওোর স্টেডিয়াম, এই সব কেন্দ্রে যাত্রী পরিবহণের জন্য মেট্রো রেল ও সার্কুলার রেল ভাল ভাবে পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ট্যুরিস্ট বাস সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে। এই জন্য ড্রাইভারদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

পর্যটকদের সুবিধার জন্য স্টেডিয়াম, থিয়েটার, যাদুঘর সহ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বিদেশী ভাষায় পরিভাষা নির্ঘণ্ট, গাইড বই, থিয়েটার, হোটেল, দ্রষ্টব্য স্থান, বিমান বন্দর, রেল স্টেশন ও রেস্টুরেণ্টের ম্যাপ এবং প্রধান পরিবহণ রুট ও গাড়ী রাখবার জায়গা নির্দেশক মানচিত্র ছাপানো হচ্ছে।

ট্র্যাফিক কণ্ট্রোল ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে পথ নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে করা হচ্ছে বিপদ মুক্ত। এইজন্যে ওলিম্পিক কেন্দ্র নির্দেশক ২০০টি উজ্জ্বল আলোকিত সাইনবোর্ড বসানো হবে। ইতিমধ্যেই রুবলিভো রোড, লেনিনগ্রাদ ও ভোলোকো-লামস্ক রোডে তা লাগানো হয়েছে।

ইনফরমেশন চিহ্নিত বিশেষ টেলিফোন বসানো হয়েছে বহু সংখ্যক মেট্রো রেল স্টেশনে। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে এখানে আগ্রহীদের জার্মান, ফ্রান্স ও ইংরেজি ভাষায় উত্তর দেওয়া হবে। ওলিম্পিক চলাকালে প্রতিটি মেট্রো রেল চালক প্রতিটি স্টেশনে রুশ ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় নিকটবর্তী উল্লেখযোগ্য স্থানের পরিচয় জানাবেন।

যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে

প্রতিযোগী, সাংবাদিক, কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ওলিম্পিক কমিটিগুলির কর্মকর্তাদের জন্য সংগঠনী কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তাদের হাতে যাত্রী গাড়ি ছেড়ে দেবে। জাতীয় দলগুলি পাবে বাস ও মিনি বাস। প্রয়োজনের কথা আগে জানিয়ে দিলে বেশী গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে।

নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে বাস টার্মিনাস থেকে ওলিম্পিক গ্রাম, ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে যাতায়াত করবে এক্সপ্রেস বাস। সাংবাদিকদের হোটেল থেকে প্রধান প্রেস কেন্দ্র, ওলিম্পিক টি ভি ও রেডিও কেন্দ্র ও ওলিম্পিক কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য থাকবে বিশেষ বাস।

অতিথি, পর্যটক ও সাংবাদিকদের লেনিন সেণ্ট্রাল স্টেডিয়ামে মস্কোভা নদী দিয়ে স্পীড বোটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

মস্কো ওলিম্পিকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ২৭০০ যাত্রী বাস ও মিনিবাস দরকার হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই গাড়িগুলি নেওয়া হবে ভল্গা যাত্রী বাস, রিগা মিনিবাস ও ল্ভোভ ও লিকিনো বাস থেকে। ট্যুরিস্টদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে ৭ হাজার বাস।

প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় নৌকা, ঘোড়া ও সাইকেল পরিবহণ এবং ওলিম্পিক মশাল বহনকারীদের সঙ্গে থাকবার জন্য বিশেষ ধরনের মালবাহী গাড়ি তৈরি করা হয়েছে সংগঠনী কমিটির দেওয়া ডিজাইন মত। প্রাথমিক ট্রায়ালে তা উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

ওলিম্পিক কেন্দ্রগুলির কাছে পার্কিং প্লেস তৈরি হচ্ছে। এখানে ৯৯০০ যাত্রী গাড়ি ও ১৯০০ বাস রাখবার জায়গা হবে।

পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সোভিয়েত ইউনিয়নে পথ পরিবহন নিরাপত্তা রক্ষা করে স্টেট মোটর ট্রান্সপোর্ট ইন্সপেকশন সার্ভিস (রুশ ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত নাম—জি এ আই)। জি এ আই কর্তা এ পি এন-এর সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছেন।

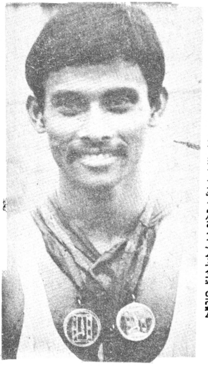
তিনি বলেছেন যে, ওলিম্পিক দেখতে বহু পর্যটক মোটর নিয়েই আসবেন। ফলে গাড়ির সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই সমগ্র অবস্থার পটভূমিতে জি এ আই-এর পরিকল্পনা মত মস্কো সোভিয়েত সমগ্র শহরের জন্য অটোমেটিক ট্র্যাফিক টেলি-কণ্ট্রোল সিস্টেম চালু করেছে। এর-প্রধান নীতি হল—শহরের প্রধান প্রধান গতিপথে গাড়ির গতিধারা অব্যাহত রাখা, বিশেষভাবে ওলিম্পিক কেন্দ্রমুখী পথে। এই জন্য পথের মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। ৪০টি টি ভি ক্যামেরা রাস্তায় বসানো হচ্ছে। এগুলি যুক্ত থাকবে জি আই ই পরিচালকদের সঙ্গে। এর একাংশের কাজ ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। ১৯৮০ সালের আগেই প্রধান শহর কেন্দ্রের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কম্প্যুটার পরিস্থিতি অনুসারে পথ বাতলে দেবে। দুর্ঘটনার কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হলে টি ভি ক্যামেরা ট্র্যাফিক কণ্ট্রোলারকে সংবাদ দেবে। কোথাও গাড়ির জট পাকিয়ে গেলে কম্প্যুটার সংক্ষিপ্ত পথের নির্দেশ দেবে।

এতবেশী সংখ্যক গাড়ি আসা সত্ত্বেও শহরের পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রথমত কোন গাড়ী কতটা বিষাক্ত গ্যাস ত্যাগ করে তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরূপণ করা হচ্ছে এবং বিপদসীমার কাছে এলেই সেই গাড়ির চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত মস্কো শহরের কেন্দ্রস্থলে ট্র্যাক আসা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে গুদাম ঘর কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে রেখে। তারপরে শহরে বড় গাড়ীর একাংশ চলে তরল গ্যাসের সাহায্যে এবং আর একাংশ ইলেকট্রিকের সাহায্যে।

ঢাকায় জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে মফঃস্বলের প্রতিযোগীদের কৃতিত্ব

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ ঃ সম্প্রতি জাতীয় খেলাধূলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ষষ্ঠ জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল ছিল ৫টি। দলগুলো ঃ খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, মেট্রোপলিশ এবং রেলওয়ে দল। ২৭৮·২২ পয়েন্ট পেয়ে রেলদল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স হয়েছে রাজশাহী দল ৬৭·৬৩ পয়েন্ট পেয়ে। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেশের ৪টি বিভাগের মধ্যে ৩টি বিভাগ প্রতিনিধিত্ব করলেও কথা উঠেছে এসব বিভাগের অনেক জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে এবারের জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স-এর খবরই পৌঁছয়নি আগেভাগে। যার দরুন আন্তঃজেলা জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়নি অনেক জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে। আর সেই কারণেই অপরাপর বারের মত এবারের জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স-এর আসরে নতুন মুখের দেখা মেলেনি

অবশ্য এবারে যেটা সকলকে বিস্ময়াভূত করেছে তা হল মফঃস্বলের জিমন্যাস্টদের কৃতিত্ব। ব্যবস্থাপক বা সংগঠকদের দেওয়া সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়াই তারা নিজ অধ্যাবসায়ের গুণে, আপন কৃতিত্বে বিচারকদের মুগ্ধ করে শিরোপা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের প্রতিযোগী দিনাজপুরের কিশোরী রওশন আরা ছবি আপন কৃতিত্বে ছিনিয়ে নিয়েছে



প্রথমবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দেওয়ান নজরুল হোসেন/খন্দকার তারেক

দুটো সোনা আর একটা রুপো। আর এইসব জেতার সুবাদে এবারে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা বিভাগের সেরা জিমন্যাস্ট বলে স্বীকৃত হয়েছে রওশন আরা ছবি। রানার্স ঢাকা বিভাগের পারভিন লায়লা লুসি।

পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ে দলের দেওয়ান নজরুল হোসেন। নজরুল এবারের প্রতিযোগিতায় লংহর্স, হরাইজনটাল বার, প্যারালাল বারে সোনা আর রোমাক রিং এবং ফ্লোর এক্সারসাইজে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। রানার্স হয়েছেন রেলওয়ে দলেরই মোহম্মদ কাওসার।

ছবি দিনাজপুরের কসবা সেন্ট ফিলিপস মিশনারী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। এবারের প্রতিযোগিতায় সে ব্যালান্স বিম ও সাইড হর্সে সোনা এবং ফ্লোর এক্সারসাইজে রুপো জিতেছে। ছবির কথা হলো ও যদি ঢাকার মত সুযোগ সুবিধা পেত তাহলে সবগুলো সোনাই সে জিততে পারতো।

বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন আগামীতে দেশের সকল প্রান্তের জিমন্যাস্টদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ও সকল জেলা সংস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হবে আশা করি।

প্রথম মেয়েদের ওপেন ভলিবল

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্প্রতি ঢাকা ভলিবল স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মত মেয়েদের ওপেন ভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। প্রতিযোগিতায় মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে।

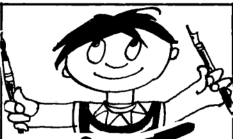


খুলনা মহিলা ভলিবল দল/খন্দকার তারেক

একথা সত্যি, যখন এ প্রতিযোগিতার খবর জানা গিয়েছিল তখন কেউই ভাবেনি যে মেয়েদের ভলিবলে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে—কিন্তু প্রতিটি খেলাই প্রমাণ করেছে মেয়েদের প্রতিযোগিতাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাস্বর হতে পারে। বিশেষ করে ঢাকার আবাহনী ক্রীড়া চক্রের মহিলা ভলিবল দল আর খুলনা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দল যে দাপট দেখালো তা অনেককেই অবাক করেছিল। আর খেলাগুলো এমনই জমেছিল যে দর্শকদের ভীড়ে ছোট্ট ভলিবল স্টেডিয়ামটি টই টম্বুর ছিল ওই কটা দিন। বিশেষ করে এই দুই দলের মধ্যে চূড়ান্ত খেলার দিন দর্শকদের ভীড়ে স্টেডিয়ামের একটু জায়গাও খালি ছিল না।

চূড়ান্ত খেলার প্রথম থেকেই আবাহনী আর খুলনা দলের মেয়েরা আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে খেলতে থাকে। খুলনার স্ম্যাশার হেলেনা খান সাবলীল ভঙ্গিতে পর পর সফল স্ম্যাশ করে আবাহনী দলের মেয়েদের একেবারে পর্যুদস্ত করে তোলে এবং সহজেই প্রথম সেটটা জিতে নেয়। আবাহনীর মেয়েরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী ছিল না, তারা দ্বিতীয় সেটের শুরু থেকে গেমটা জেতার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকে এবং দ্বিতীয় সেটটা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তৃতীয় সেটটা সহজেই জিতে নেয় খুলনার মেয়েরা। চতুর্থ সেটে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের পাল্লা ওঠে তুঙ্গে। এক পর্যায়ে আবাহনীর মেয়েরা ১৯-৮-এ এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত খুলনার মেয়েরা বিজয়ী হয়ে ওপেন মহিলা ভলিবলের শিরোপা ছিনিয়ে নেয়।





উঠছে যারা



গোল

সাব্বির কাকু গোল দিয়েছে
আমার ভীষণ মজা
তাইতো বাবা আজ সকালে
আনলো কিনে গজা।

সোমা ঘোষাল (১২), কসবা



চিঠি

সম্পাদক কাকু,

আমার প্রণাম নেবেন। এবারে মোহনবাগান তো লিগ পেল, আমার ভীষণ ভাল লাগছে। কিন্তু আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে। ১৩ আগস্ট আমাদের পাড়ার দাদারা একটা পালতোলা নৌকা বানিয়েছে। আমার খেলার আসর থেকে সব ছবি কেটে তারা নৌকোয় লাগিয়েছে। ক্যাপ্টেন কাকুর ছবি সবার উপরে দিয়েছে। আমার সব বই ওরা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। আচ্ছা সম্পাদক কাকু, এবারে দিলীপ কাকু বেশী খেলেনি কেন বলতে পারেন? দিলীপ কাকুকে আমার খুব ভাল লাগে। দিলীপ কাকুর একটা অটোগ্রাফ দিলে খুব মজা হবে। আমি বন্ধুদের দেখাব। ওরা বলে ইস্টবেঙ্গল দল অনেক ভাল, কিন্তু বাবা বলেন দিলীপ কাকু খুব ভাল খেলোয়াড়। কোনটা ঠিক বলুন তো? আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

পিনাকী দত্ত (১৩), কলকাতা-৬

ছড়া

আজকে দাদা
গোল দিয়েছে বারো
মেজাজখানা ঠিক থাকলে
দিতেন নাকি আরো।
দাদা বলেন, নেই খেলোয়াড়
এমন একটা দেশ
পেলের মত গোটা কয়েক
থাকলে হতো বেশ।

বাবুন ঘোষ (১২), কলকাতা-৪



সমান সমান

সাব্বির দাদা মানস দাদা
গোল দিয়েছে সমান
দু-জনাই বড় খেলোয়াড়
করল এবার প্রমাণ।
দু-দাদাতে পাল্লা দিয়ে
গোল করেছে অনেক
তাইতো আমি লিখছি ছড়া
ভাবছি বসে ক্ষণেক।

টিনা ঘোষ (১৪), কলকাতা-৩



কলকাতায় সারা ভারত ওয়াটারপোলো কেমন হয়েছে

ভুবনেশ্বর পাণ্ডে ঃ কলকাতার দশটি ক্লাব ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচটি দলকে নিয়ে ওয়াই এম সি এ পরিচালিত সর্বভারতীয় ক্লাব ভিত্তিক আমন্ত্রণ ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল দল। লিগের ভিত্তিতে খেলায় মোট চারটি গ্রুপের প্রধান ৪টি দল, ইস্টার্ন, সাউথ ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন রেল ও সেন্ট্রাল ক্লাব সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে ওয়াটারপোলোতে, ভারতীয় তিনটি রেল দলের প্রাধান্যই ছিল সব থেকে বেশী। ওয়েস্টার্ন রেল দলের গ্রুপে ওয়েস্টার্ন ন্যাশনালকে ১৮-৫ গোলে হারায়। সাউথ ইস্টার্ন ২৫-১ গোলে আহিরিটোলাকে হারায়। ইস্টার্ন ১১-০ গোলে কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্টকে হারায়। সেন্ট্রাল ৯-২ গোলে ইস্টার্ন এয়ার কমাণ্ডকে পর্যুদস্ত করে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় গোলের ছড়াছড়ি কলকাতার দর্শক সমাজকে হতাশ করেছে।

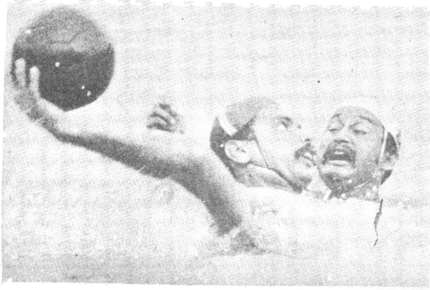
তবে গ্রুপের লড়াইতে কলকাতার দুটি ক্লাব সেন্ট্রাল ও ওয়াই এম সি—এর খেলা জমজমাট হয়েছিল। খেলার ফল হয়—৪-৪। দুটি দলেই তরুণ খেলোয়াড়দের দাপট ছিল। জাতীয় সাঁতারের আসরে বাংলার দল গঠনের ক্ষেত্রে এই দুটি ক্লাবের খেলোয়াড়রাই যে বেশী মাত্রায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। সেন্ট্রালের তপন পাল, জয়ন্ত সেন, তরুণ সরকার ও প্রবীর সরকার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওয়াই এম সি এ-র অসিত সাঁতরা, দিবোন্দু সাহা, দীপক ভট্টাচার্য ও গোলে অনিত সাহা সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে সেমিফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেল দলের সঙ্গে সেন্ট্রালের খেলা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। খেলার প্রথম দুই চক্র অবধি সেন্ট্রাল ওয়েস্টার্নকে এমনই কোণ-ঠাসা করে রেখেছিল যে ওয়েস্টার্ন খেলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। ওয়েস্টার্ন রেল দলে এম এস রানা, দিলীপ পাওলে ও অরুণ মার্চেন্টের মতন ভারতজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও প্রথম দুই চক্রে সেন্ট্রালের খেলোয়াড়দের দাপট তারিফ করার মতন। শেষের দুই চক্রে সেন্ট্রালের খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞতার অভাবে এবং কিছুটা দম হারিয়ে ফেলে ১০-৬ গোলে হেরে যেতে বাধ্য হয়। কলকাতায় সর্বভারতীয় পর্যায়ে খেলার আসর বারবার বসানো হলে আমাদের উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়রা তাদের ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে জাতীয় আসরে এখনও চমক সৃষ্টি করতে পারে। কারণ একমাত্র বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল দল ছাড়া কেরালার ডলফিন ক্লাব, ভারতীয় নৌভি দল ও ইস্টার্ন এয়ার কমাণ্ড দল প্রত্যেকেই কলকাতায় অতি সাধারণ ক্লাবের কাছে অতি সহজেই পরাজিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্নের লড়াই ছিল ইজ্জতের। বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের ৭ থেকে ৯ তারিখ আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রেল দলের তিন প্রধানের (ইস্টার্ন, সাউথ ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন) লড়াইয়ের প্রাথমিক শক্তি পরীক্ষা কলকাতাতেই হয়ে গেল। যদিও কলকাতার জয় পরাজয় কোনভাবেই আন্তঃরেল প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করবে না—কারণ আন্তঃরেলের লড়াই অন্য ধরনের। ওয়াটারপোলোর সমস্ত ধারা, আইন-কানুনকে উপেক্ষা করে গত কয়েক বছর ধরে আনাড়িদের দিয়ে পরিচালনার মাধ্যমে শ্রেষ্টত্বের মানদণ্ড যেভাবে বিচার করা হচ্ছে তাতে আন্তঃরেল ওয়াটারপোলো প্রহসনমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

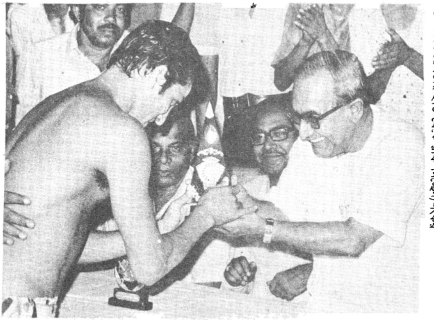
সুতরাং আন্তঃরেলের প্রাক্কালে কলকাতার জয়পরাজয়কে ঘিরে বিভিন্ন রেলের খেলোয়াড়দের মনে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করলেও কোন দলই বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গতবছর আন্তঃরেল প্রতিযোগিতার প্রায় দিন কুড়ি আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ডালমিয়া ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টার্ন রেল দল। রানার্স ছিল সাউথ ইস্টার্ন। ওয়েস্টার্নের নাম ক্রমিক পর্যায়ে ছয়জনের মধ্যেও ছিল না। কিন্তু বোম্বাই-এর আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় দেখা গেল ওয়েস্টার্ন চ্যাম্পিয়ন, সুতরাং যোগ্যতার বিচার একমাত্র সেখানেই আশা করা সম্ভব যেখানে উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন হয়।

ওয়াই এম সি এ-র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু ছোটখাট ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিকভাবে পরিচালনার মান ছিল উচ্চস্তরের। সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবাংলায় ওয়াটারপোলোর রেফারি বোর্ড আছে—যেখানে ওয়াটারপোলোর পরিবর্তিত আইন-কানুন নিয়ে খেলোয়াড় ও পরিচালকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে মাতামাতি লেগে থাকে। সারা ভারতের মধ্যে আমার মনে হয় একমাত্র কলকাতা ছাড়া আর কোথাও ওয়াটার-পোলোর আইন-কানুন নিয়ে এত চর্চা হয় না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রেফারিরা সুযোগ পেলে আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা নিয়ে কলকাতার রেফারিদের পরামর্শ নেয় এমন ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ওয়েস্টার্ন রেলের অধিনায়ক অরুণ মার্চেন্ট খেলার শেষে কলকাতার দর্শকদেরও ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন।

আগস্টের এগার তারিখে কলকাতার প্রায় ৭-৮ হাজার দর্শক জমায়েত হয়েছিলেন কলেজ স্কোয়ারের ওয়াই এম সি এ-র সীমানায় ফাইনাল খেলা দেখতে। ওই দিনের আকর্ষণ ছিল দুটি। সেন্ট্রাল ও সাউথ ইস্টার্নের মধ্যে তৃতীয়-চতুর্থ স্থানের লড়াই এবং ফাইনালে বিজয়ীর সম্মান কে পায় তা দেখার তাগিদ।



গোলমুখেই ওয়েস্টার্নের অধিনায়ক অরুণ মার্চেন্টকে রুখে দিচ্ছে ইস্টার্নের গৌরাঙ্গ/শংকর



ওয়েস্টার্ন রেলের পাওলে পেলেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর হাত থেকে ট্রফি নিচ্ছেন/শংকর

ওয়াই এম সি এ-র এই প্রতিযোগিতায় এই বছর প্রথম সাউথ ইস্টার্ন রেল কলকাতার ক্লাবগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার সংকল্প নেয়। গ্রুপের খেলাগুলিতে সাউথ ইস্টার্ন অনায়াসেই আহিরিটোলা, কলকাতা পুলিশ ও কেরালার ডলফিন ক্লাবকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। সেমিফাইনালের খেলায় ইস্টার্নের মুখোমুখী হয়ে সাউথ ইস্টার্ন ৬-১ গোলে হেরে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেল। ফলে ইস্টার্ন-সাউথ ইস্টার্নের খেলা যেমন আশা করা গিয়েছিল তেমন হয়নি। শুরু থেকেই ইস্টার্ন এগিয়ে ছিল। কোন সময়ই ইস্টার্নকে সাউথ ইস্টার্ন ধরতে পারেনি। সাউথ ইস্টার্নের ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতাই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। কিন্তু সাউথ ইস্টার্ন ও সেন্ট্রাল ক্লাবের খেলা উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। সাউথ ইস্টার্ন প্রথমে গোল দিয়ে এগিয়ে গেলেও খেলার দ্বিতীয় চক্রের শেষে সেন্ট্রাল গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে সাউথ ইস্টার্ন হেরে গেল সেন্ট্রালের কাছে। কলকাতার ওয়াটারপোলো অনুরাগীদের কাছে সাউথ ইস্টার্নের এই পরাজয় ইন্দ্রপতনের মতন। কেবল নিজেদের মধ্যে অনুশীলন করলেই শক্তি যাচাই করা যায় না বা তাদের চেয়ে নিকৃষ্টমানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে মান উন্নত করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না লড়াই-এর পরীক্ষাটা সমানে সমানে হচ্ছে। মনে হয় প্রতিযোগিতায় যত বেশী অংশ নেওয়া যায় খেলায় পারদর্শিতা ততই বাড়ে। আর খেলার মান ততই নিম্নমুখী হয় যখন নিম্নস্তরের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলা যায়। সাউথ ইস্টার্ন রেল যে ভারতের একটা সেরা দল একথা অকপটে বলা যায়—মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই তাদের বিপর্যয়ের মূল কারণ।

শেষ পর্যন্ত ইস্টার্ন রেলও ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলের কাছে হেরে গিয়ে কলকাতার ওয়াটারপোলো অনুরাগীদের হতাশ করল। বাংলার মুখ ডোবাল। তবে একথা স্বীকার করতে হবে ইস্টার্ন-ওয়েস্টার্নের লড়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ। দুটি দলের কে জিতবে বলা শক্ত ছিল। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্নের খেলায় প্রথম থেকে ইস্টার্নের দাপট চোখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত বাজীমাৎ করল ওয়েস্টার্ন, শেষ চক্রের শেষ দু মিনিটের খেলায়। সুযোগ সন্ধানী ওয়েস্টার্ন রেলের ফরোয়ার্ড দিলীপ পাওলে ইস্টার্নের দুই খেলোয়াড়ের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে অতি সহজে ইস্টার্নের গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে জয়সূচক গোলটি করে ৫-৪ গোলে নিজের দলকে জিতিয়ে দিল। তবে মনে হয় ইস্টার্ন হেরেছে তাদের ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতার জন্য ইস্টার্নের ফরোয়ার্ড গৌতম খান, রঞ্জন ভড় সারাক্ষণ জলের মধ্যে ঝাপাঝাপি করে যুদ্ধ করে গেল অক্টোপাসের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। ফরোয়ার্ডের প্রধান কাজ গোলে বল মারার সুযোগ তারা নিতে পারল না। ফলে ইস্টার্নের জয়ের আশা স্কোরারদের ব্যর্থতায় অনিশ্চিত হতে লাগল যতই খেলা শেষের দিকে গড়াতে লাগল। মনে হয় বাংলার খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্তমানে ফরোয়ার্ডদের খেলা এতই নিম্নমানের যে দলকে জেতানোর ব্যাপারে তাদের কোনই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না। অথচ সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাংলার ফরোয়ার্ডরা চিরকালই ভারতের সেরা আখ্যা পেয়ে এসেছে। অতীতে পীযূষ মিত্র, তরুণ গোস্বামী, বেণীমাধব তালুকদার, মধুসূদন সাহা, অশোক বিশ্বাস, দিলীপ দেব, কার্তিক ভট্টাচার্য প্রমুখ খেলায় যে বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বর্তমান ফরোয়ার্ডদের কারও মধ্যে তার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বাংলার ওই সব প্রাক্তন খেলোয়াড়ের অনেকে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে প্রশিক্ষকতা করে চলেছেন। কিন্তু জাত ফরোয়ার্ড না হওয়ার জন্য সকলের মুখে একই যুক্তি, 'মেটেরিয়েলের অভাব।' আমার মনে হয় বর্তমান বাংলার ফরোয়ার্ডরা কোথায় দাঁড়াতে হয় জানে না, কোনখান থেকে বল গোলে মারা উচিত জানে না, কখন কি সটে গোল হয় বোঝে না এবং কি করে নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝির মাধ্যমে গোলের সুযোগ নিতে হয় তার কোন ধারণাই নেই। ওয়াটারপোলো যে বুদ্ধির খেলা, চাতুর্যের খেলা, ক্ষিপ্রতার খেলা।



চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল/শংকর

এবং সর্বোপরি দমের খেলা—এটা যেন বর্তমান খেলোয়াড়দের চিন্তাধারার বাইরে। টানাটানি, ধস্তাধস্তি ও জলে কোস্তাকুস্তির মাধ্যমে ম্যাচ জেতার প্রবণতাই এই খেলার মানকে ক্রমশ নিম্নমুখী করে তুলছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়, বাংলায় ওয়াটারপোলোতে জাত সাঁতারুর অভাব যত ঘটছে খেলার মান ততই নিম্নমুখী হচ্ছে। আগে সাঁতারুরা জাত সাঁতারুর সম্মান নিয়ে ওয়াটারপোলোতে আসত—বর্তমানে জাত সাঁতারু না হয়েই ওয়াটারপোলোতে আসার মাদকতা এত বেশী যে ওয়াটারপোলোর মান ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

পক্ষান্তরে ওয়েস্টার্ন রেল দলের জয়ের মূলে তাদের ফরোয়ার্ডদের চাতুর্য। সারাক্ষণ ইস্টার্নের হাফব্যাক সোমনাথ ঘোষ ওয়েস্টার্ন ফরোয়ার্ড দিলীপ পাওলেকে আগলে রেখেও শেষরক্ষা করতে পারল না। একটা সুযোগ পেয়ে জয়সূচক গোলে ইস্টার্নকে হারিয়ে দিল। ইস্টার্নের ফুলব্যাক গৌরাঙ্গ মল্লিক সারা ম্যাচটা অরুণ মার্চেন্টকে নাজেহাল করেও পরাজয় এড়াতে পারল না। তবে একথা স্বীকার করতে হবে ওয়েস্টার্ন রেলের জয়ের মূলে ভারতের সেই খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু এম এস রানা। রানা বারবার এগিয়ে গিয়ে


সামার্স-আপ ইস্টার্ন রেলওয়ে/শংকর

ইস্টার্নের খেলোয়াড়দের পিছনে ফেলে যেভাবে তার দলের ফরোয়ার্ডদের বল জুগিয়েছে তার থেকে আমাদের খেলোয়াড়দের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, ভাল সাঁতারু না হলে ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায় না। আমরা অতীতের খেলোয়াড়দের মুখে শুনেছি ওয়াটারপোলো খেলতে হলে মনে রাখতে হবে 'দম রাজা, কৌশল মন্ত্রী' সুতরাং রানার খেলায় বারবার ওঠানামা সেটাই প্রমাণ করে দিল ওয়াটারপোলো খেলতে হলে আগে চাই দম, তারপর কৌশল। বল পাওয়া ও বল মারার মধ্যে চোখের নিমেষে ছোঁড়ার কৌশল, (যেটা বাংলার কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে চোখে পড়ে না) আয়ত্ত করতে হলে বোম্বাই-এর দিলীপ পাওলের খেলা অনুকরণ করার মতন। যেকোন অবস্থা থেকে বলকে গোলে পাঠানো, সেণ্টার ফরোয়ার্ডের এই প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে বোম্বাই-এর অরুণ মার্চেন্টের খেলা প্রশংসার। বয়সে প্রবীণ হলেও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অপরকে বোকা বানিয়ে সুন্দর গোল করা যায় বিশ্বনাথ ট্যাকলের খেলা সেটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে খেলোয়াড় ও দর্শক-মহলে ইস্টার্নের বিপক্ষে দুটি গোলকে কেন্দ্র করে নানা বাদানুবাদ শোনা যায়। রেফারির বিচারে গোল না মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও লাইন্সম্যানের নির্দেশে গোল দেওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে দর্শক-মহলে অসন্তোষ কিছুটা প্রকাশ পেলেও খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব কখনও দেখা যায়নি। গোল হয়েছে কি হয়নি, (কারণ ওয়াটারপোলোতে সম্পূর্ণ বল বার পোস্টের মধ্যে ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত গোল হওয়ার নিয়ম নেই) এই তর্কে উপনীত না হয়ে শুধু একটা কথাই বলতে পারি বাংলার রেফারি বোর্ড আলখাল্লার অন্তরালে যে সতীপনার নিদর্শন দেখাল ভারতীয় ওয়াটারপোলো সমাজে তার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গত বছর বোম্বাইয়ে আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলকে দাবিয়ে ওয়েস্টার্নকে চ্যাম্পিয়ন করার যে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করা হয়েছিল, সেখানে ইস্টার্নের বিরুদ্ধে বিতর্কিত দুটি গোলের জোরে কলকাতায় এক গোলের ব্যবধানে জিতে ওয়েস্টার্ন খেলোয়াড়রা খেলার শেষে দীপ্তকণ্ঠে বার বার স্বীকার করেছে 'কলকাতার রেফারিং উচ্চমানের এবং কলকাতার রেফারি বোর্ডের সবাই নিরপেক্ষ।' হায় অদৃষ্ট! জাতীয় পর্যায়ে ওয়াটারপোলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কলকাতার রেফারিরা তবুও কেন উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং অপরের কৃপাপ্রার্থী?

ওয়াই এম সি এ-র রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার বড় ওয়াটারপোলো আসর বসাবার জন্য কলকাতার সাঁতার-পাগল সমাজ যেমন সাধুবাদ জানিয়েছে—নিন্দাও করেছে তেমনি। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিযোগীরা সকাল আটটা থেকে বারোটা আবার দুপুর আড়াইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত জলের ধারে অতন্দ্র প্রহরীর মতন প্রতিযোগীরা খেলা দেখে এবং খেলা শেখার লোভে দাঁড়িয়ে থেকে, এমনকি জলের লড়াইতে অংশ নিয়েও ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সান্ত্বনামূলক একটা খাবারের প্যাকেট পায়নি। বাইরের দলকে খাবারের জন্য টাকা, হাত খরচের টাকা, ট্রেনের ভাড়া দেওয়া হয়েছে—স্থানীয় দলগুলিকে খেলার পরিশ্রমের পর খাবারের একটা প্যাকেট দিয়েও খুশী করতে পারেনি। অথচ রেফারিদের চিকেন বিরিয়ানী দিয়ে প্রতিদিনের লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। ◼

কিংবদন্তীর ফুটবলার রিভেরা মাঠ ছাড়লেন

বিশেষ প্রতিনিধি : অবশেষে ইতালির সেই সোনা ছেলেটির বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এল। গিয়ানি রিভেরা। ...এ যুগের ফুটবলে কিং-বদন্তীর নায়ক। মাঠ থেকে বিদায় নিলেন। অবশ্যই সম্মানের এভারেস্টে থাকতে থাকতে।

রিভেরার ক্লাব মিলান এবারও তার নেতৃত্বে ইতালির চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অবশ্য কয়েক মাস আগে থেকেই অনেক ফুটবল-বোদ্ধা কলমচী রিভেরাকে এই হুঁশিয়ারী দিচ্ছিলেন, তিনি তার ফুটবল-জীবনকে অত্যন্ত বেশী দীর্ঘ করে চলেছেন। ৩৬ বছরে পা দেওয়ার মুহূর্তে রিভেরার এই অবসর গ্রহণ তার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী মহলে তাই বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছে।

একজন দুর্লভ দৈহিক কাঠামো ও নৈপুণ্যের ফুটবলার হিসেবে ষাটের দশকে রিভেরা প্রতিষ্ঠা পান। আক্রমণ গড়া এবং গোল দেওয়ায় তার অনবদ্য কৃতিত্ব তাকে ফুটবলের দেবমণ্ডলীতে স্থান করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার চোখ জুড়ানো ভঙ্গিমা বিরল। সম্ভবত তার এই গুণটিই তাকে জাতীয় বীরের সম্মান এনে দিয়েছে।

সারা জীবনে তিনি ৯০০ ফুটবল ম্যাচে



চারবার বিশ্বকাপ সহ ৯০০টি ফুটবল ম্যাচ খেলে জিয়ানি রিভেরা অবসর নিলেন

খেলেছেন। ইতালিতে তিনি একমাত্র খেলোয়াড় ইউরোপীয় 'ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' (১৯৬৯) সম্মান পেয়েছেন। ইতালিতে তিনি একজনই—চারবার বিশ্বকাপ খেলেছেন। ১৯৬২ (চিলি), ১৯৬৬ (ইংল্যাণ্ড), ১৯৭০ (মেক্সিকো) এবং ১৯৭৪ (পঃ জার্মানি)।

নিজ ক্লাব মিলানকে তিনবার ইতালি চ্যাম্পিয়ন করেন এই রিভেরা। তার সময়ে মিলান চারবার ইতালিয় কাপ জয়ী, দু'বার 'ইউরোপীয় কাপ', দু'বার 'কাপ উইনার্স' কাপ এবং 'ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল কাপ' জয় করেছে।

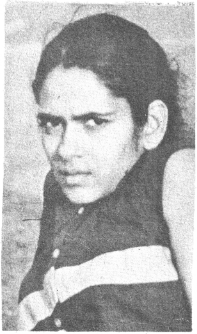
অবসর গ্রহণের ইচ্ছা ঘোষণার দিন রিভেরা বলেন, 'নতজানু হয়ে বিদায় গ্রহণের আগে আমি খেলা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করি। সময় হয়েছে, মাঠ থেকে ঘরে ফেরার।'

'অবসর ক্ষণে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিরেক্টরদের, আমার বন্ধুদের, আর যারা আমাকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠতে অনেকের চেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন সেই সাংবাদিককুলকে। আজ আমার জীবনের সব থেকে বিষাদময় দিন।'

'তবে আমি নিশ্চিত যে আমাকে ছাড়া আমার সতীর্থরা ক্লাবকে সম্মানের শীর্ষে রাখতে সক্ষম হবে। এবছর দেশের শ্রেষ্ঠ দল হওয়ার ঘটনাই সেই বিশ্বাস দৃঢ় করেছে।'

রিভেরা বুট-হোস তুলে রাখলেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করবেন না, বা করতে পারবেন না। তাকে অবশ্য মিলান-এর সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। দেখা যাক, খেলোয়াড়-উত্তর জীবনে ক্লাব-কর্মকর্তা রিভেরা হন কিনা!

অণিমার জেদ আছে, লেগে থাকার ক্ষমতা আছে



শান্তশিষ্ট অ্যাথলিট অণিমা ব্রহ্ম

স্টাফ রিপোর্টার : টোকিওর এশিয়ান অ্যাথলেটিক মিটে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিল স্প্রিণ্টার অণিমা ব্রহ্ম। এই প্রথম তার কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বা বিদেশ যাওয়া।

অণিমা টোকিওতে খুব একটা ভালো ফল করতে পারেনি। ৪০০ মিটার দৌড়ে অণিমা হিটে বিজয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল তবে ফাইনালের ফল উল্লেখযোগ্য নয়। টোকিওতে অণিমার পারফরম্যান্স নিয়ে ইলিয়াস বাবর অণিমাকে চিঠি দিয়েছেন। অণিমার কাছে যে চিঠিটার মূল্য সোনার পদকের চেয়ে কম নয়। বাবর সাহেব লিখেছেন, অণিমার অসাফল্যের পেছনে কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ আছে, যার বেশীর ভাগই আরোপিত। বাবরের চিঠির বক্তব্য অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার ব্যবস্থার প্রতিই কটাক্ষ করেছে।

টোকিওতে যাওয়ার আগে পাতিয়ালার ক্যাম্পে অণিমার কোচ ছিলেন কমলজিৎ সাঁধু। অণিমা খুবই শান্তশিষ্ট ইনট্রোভার্ট ধরনের মেয়ে। কেরিয়ারের শুরুতে ওকে বরং খানিকটা ভীতুই মনে হচ্ছিল। আমি কিছু জানি না, কিছু বলবো না ভাব নিয়ে সারাক্ষণ রইলো। তবে শোনা গেছে পাতিয়ালাতে কমলজিৎ-এর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সময় অণিমার মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কমলজিৎ-এর অনুপস্থিতে অণিমা অন্য এক অ্যাথলিটকে দিয়ে তার দৌড়ের টাইম নিয়েছিল। কমলজিৎ জানতে পেরে খুব ক্ষুন্ন হন। রীতি অনুযায়ী অণিমা হয়ত ঠিক কাজ করেনি; কিন্তু একজন অল্প বয়সী মেয়ে এই প্রথম বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে, এ সময় তার মানসিক উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করে কোঁচ হয়ত ব্যাপারটাকে আরো সহজভাবে নিতে পারতেন। আইন বা ক্ষমতা দিয়েই তো আর সব সময় সব ঘটনার মোকাবিলা করা উচিত নয়।

দক্ষিণ বারাসতের মেয়ে অণিমা। ও জায়গাটাকে গ্রাম বলা হলে, হয়ত টেকনিক্যালি ভুল বলা হবে, তবে শহর তো নয়। কলকাতার মত শহরেও মেয়েদের খেলার মাঠে আসা বা টি'কে থাকার ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেককেই কম বেশী অনেকগুলো বাধার পাঁচিল ডিঙতে হয়। গ্রাম্য সমাজ স্বভাবতই আর একটু রক্ষণশীল। অণিমার মাঠে আসাটা তাই প্রথমদিকে খুব একটা সহজ হয়নি। দক্ষিণ বারাসতের অ্যাথলেটিক ক্লাব আর অণিমার ইচ্ছে, এই দুটো জিনিস ওকে মাঠে ধরে রেখেছিল। তাও তো প্রথমদিকে প্র্যাকটিসের মাঠ ছিল না। অণিমার সে সময়কার কোচ যিনি ছিলেন, তিনি বলতেন, স্কুল ছুটি হলে যত জোরে পারবি ছুটে বাড়ি ফিরবি। এটা ঠিক প্র্যাকটিস নয় ব্যাপারটা খানিকটা 'নেই মামা'-র বদলে 'কানা মামা' থাকার মত। ওইটুকুতেই যা একটু নড়াচড়া হল। অণিমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে দেখে পরে ক্লাব থেকে কোচ সুজিত সিংহের তত্ত্বাবধানে কলকাতার অ্যাথলেটিক ট্রেনিং সেণ্টারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোল। অণিমার অ্যাথলিট জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু সেখান থেকে।

অণিমা এখন রেলে চাকরি করছে, থাকে কলকাতার ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে। সপ্তাহ শেষে বাড়ি যাওয়া। প্র্যাকটিস, কম্পিটিশন ইত্যাদির ব্যাপারে বাড়ির আর সকলের মত অণিমার মা-র আগ্রহটাও উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রচলিত ধারণায় তার কিশোরী মেয়ের কলকাতায় একা থাকা, নিয়মিত ছোটাছুটি করা ইত্যাদিতে তার হয়ত কিছুটা সংশয় ছিল। অণিমার সাফল্য সে সব অবরোধ ভেঙে দিয়েছে।

বিদেশে গিয়ে কি অভিজ্ঞতা হল, ভিন্ দেশের অ্যাথলিটদের টেম্পারামেণ্ট কেমন, প্রতিযোগিতার আগে কিভাবে তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত হয়, ওদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় কি আছে, ইত্যাদি প্রশ্নে অণিমা হয় নীরব, অথবা খুব ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছে।

'সুযোগ সুবিধের দিক থেকে আমরা এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে হয়ত অনেকটা পিছিয়ে। কলকাতায় এমনি মাঠে প্র্যাকটিস করি, পাতিয়ালাতে গিয়ে সিণ্ডার ট্র্যাক পেয়েছিলাম আর টোকিওতে গিয়ে দৌড়েছি একেবারে টার্টান ট্র্যাকে, এসব অসুবিধে আমাদের সব ভারতীয় অ্যাথলিটেরই। টেকনিক্যাল ব্যাপারে এধরনের দু' একটা ব্যাপার ছাড়া ওদের আমাদের আর তফাৎ কি?'

অণিমার জেদ আছে, লেগে থাকার ক্ষমতা আছে। তার সঙ্গে আছে প্রতিভা। বিখ্যাত কোচ কেনি বোসেন কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'একজন স্প্রিণ্টারের শতকরা ৯০ ভাগ নিজস্ব প্রতিভা, বাকিটুকু কোচের গাইডান্স। আমি বারবার একটা কথা বলি স্প্রিণ্টে ভারতে প্রতিভা আছে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারলেই আমরা অনেকটা এগোতে পারব।' তাই সঙ্গত কারণেই অণিমার কাছ থেকে আরো বড় কিছু আশা করা যায়।

খেলা নয় খেলা

বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত

সব খেলা খেলা নয়
নাম তবু খেলা
রাম আলি আকবর
খেলে হেলাফেলা।

খেলে যারা খেলোয়াড়ী
নিয়ে মন প্রাণ
তারাই মাঠের রাজা
পায় সম্মান।

মন আর শরীরের
ঠিক সাথে সাথে
খেলা চাই নিয়মিত
দিনে নয় রাতে।

প্রীতি আর ভালোবাসা
খেলাতেই বাড়ে
দুই দলে জমে খেলা
কেউ জেতে হারে।



এবারেই জেলাগুলিতে আই এফ এ শিল্ডের খেলা বেশি হচ্ছে

স্টাফ· রিপোর্টার—গতবারের মত এবারও আই এফ এ অফিসে লটারি করে ঠিক হয়েছে, '৭৯-র শিল্ডে কে কোন দিকে খেলবে। ইস্টবেঙ্গলের দিকে থাকছে দক্ষিণ কোরিয়া একাদশ এবং মোহনবাগানের দিকে পড়েছে কুয়েতের কাজমা ক্লাব। গতবার একটি মাত্র বিদেশী দল শিল্ডে খেলতে এসেছিল—রাশিয়ার আরারাত। দলটি ইস্টবেঙ্গলের দিকে পড়েছিল।

দক্ষিণ কোরিয়া একাদশের প্রথম খেলা ৭ সেপ্টেম্বর, কাজমা ক্লাবের ৮ তারিখে। দুটি দলই খেলবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। দক্ষিণ কোরিয়া দলের আসা নিশ্চিৎ, তবে কাজমা ক্লাব যদি শেষ পর্যন্ত না আসে তবে তার বিপক্ষ দল ওয়াকওভার পাবে।

কলকাতার দলগুলোর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের দিকে থাকছে এরিয়ান, এবং মোহনবাগানের দিকে মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গল প্রথম খেলবে ৫ সেপ্টেম্বর, অক্ষ ক্লাব ও টালীগঞ্জ অগ্রগামীর বিজয়ীর সঙ্গে—কোয়ার্টার ফাইনালে। মোহনবাগান প্রথম খেলবে (কোয়ার্টার ফাইনাল) ৬ সেপ্টেম্বর। খেলতে হবে সম্ভবত ইস্টার্ন রেল ও নাগাল্যাণ্ড ক্লাবের বিজয়ীর সঙ্গে।

আই এফ এ শিল্ডের খেলা কলকাতায় শুরু হচ্ছে ২২ আগস্ট, জেলায় শুরু হচ্ছে কোথাও ২৪ আবার কোথাও ২৫ আগস্ট। পাঁচটি ক্লাস্টারে ভাগ করে প্রাথমিক রাউণ্ডের খেলাগুলো হচ্ছে। কলকাতা ছাড়া আসানসোল, কৃষ্ণনগর, মালদা, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, খড়্গপুর, বালুরঘাটে খেলা হচ্ছে। প্রি-কোয়ার্টার বা কোয়ার্টার ফাইনালের কিছু খেলা হচ্ছে মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়ায়। এবারই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক জেলায় আই এফ এ শিল্ডের খেলা হচ্ছে। রেফারি এস এ হাকিমকে আই এফ এ শিল্ডে খেলা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ভারতীয় যুব দলে বাংলার ফুটবলারদের নিয়ে সংশয়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চীনের সাংহাইতে আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে একুশতম এশীয় যুব ফুটবল শুরু হবে। তাই চূড়ান্ত ভারতীয় দল নির্বাচনের জন্য এবার চূড়ান্ত কোচিং ক্যাম্প বসছে বাঙ্গালোর জাতীয় ক্রীড়া ইনস্টিটিউটে। নির্ব্যাচিত সমস্ত খেলোয়াড়কে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন নির্দেশ দিয়েছে ৫ সেপ্টেম্বরেব মধ্যে বাঙ্গালোরে রিপোর্ট করতে। কিন্তু বাংলার নির্বাচিতদের অনেকেই হয়তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্যাম্পে পৌছতে পারবে না।

চূড়ান্ত কোচিং ক্যাম্পে বাংলার ১২ জন সুযোগ পেয়েছে। পাতিয়ালার প্রথম কোচিং ক্যাম্পে সাত জনকে ডাকা হয়েছিল। ষোড়শ জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের পর অবশ্য আরও সাতজন ডাক পায়। প্রথম দলটির ২ জন গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি (মহমেডান স্পোর্টিং) ও স্বপন নন্দী (মোহনবাগান) বয়স বেশি হয়ে যাওয়ায় বাদ পড়েছে। এখন বাকি যারা ডাক পেয়েছে তারা হল ঃ—

প্রাণগোপাল দাস, বিশ্বজিৎ বসু, কাশীনাথ পাল, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও মতি সিং (সকলেই এরিয়ান্স) দিলীপ পাল, সুমিত বাগচী ও স্বদেশ সেন (খিদিরপুর), কার্তিক শেঠ, প্রীতি ঘোষাল ও প্রণব ভৌমিক (রাজস্থান) এবং সুদীপ চ্যাটার্জি (বি এন আর)।

এদের মধ্যে দিলীপ, বিশ্বজিৎ(ভট্টাচার্য), মতি সিং এবং গৌরাঙ্গ গত এশিয় যুব ফুটবলে খেলে এসেছে। বিশ্বজিৎ ছিল জাতীয়দলের সহ-অধিনায়ক।

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এদের বাঙ্গালোর পেঁাছনোর কথা কিন্তু ক্লাবগুলি ছাড়তে চাইছে না কারণ লিগ শেষ হলেও শিল্ডের খেলা বাকি। এরিয়ান ও রাজস্থান ইতিমধ্যেই আই এফ এ সম্পাদক অশোকবাবুকে তাদের হয়ে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন সম্পাদক এ টি বিজয়রঙ্গমের কাছে একটু তদবির করার জন্য ধরেছে। দুটি দলই শিল্ডে অনেক দূর ওঠার কথা ভাবে। তাই ওরা এখন এতগুলি খেলোয়াড় ছাড়তে চাইছে না। তারা 'অফিসিয়াল' চিঠিও দিয়ে দিয়েছে। বি এন আর থেকে একটিমাত্র খেলোয়াড় স্টপার সুদীপ নির্বাচিত হয়েছে। ওদের জনৈক কর্মকর্তাতো স্পষ্ট বললেন, সুদীপকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারবো না, ওর 'সাবস্টিটিউট' নেই।

'খেলা'

শ্রীলা চট্টোপাধ্যায়



'খেলার আসর' পড়ি সবাই
খুঁজি খেলার কথা।
বুঝি না কেউ, খেলোয়াড়ের
মনের গোপন ব্যথা॥
গোলটি যদি করতে পারে,
তবেই বাজাই ঢোল।
একটুর ভুলে, ফস্‌কে গেলে,
লাগাই হট্টেগোল॥
(ভাবি) বছর ভরা অনুশীলন,
গোল দেবে না মোটে।
সেই দোষেতে কপালে তো
ইঁটপাটকেল জোটে॥
লাল-সবুজের চির বিবাদ,
বাঁধিয়ে রাখি মোরা।
খেলার ছলে, নিই না খেলা
এই খানেতেই গোঁড়া॥

শব্দ জব্দ

বিদিত কুমার প্রধান
দ্বাদশ শ্রেণী
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুল
পোস্ট—ভূপতিনগর
জেলা—মেদিনীপুর।

পাশাপাশি

১। ইংল্যাণ্ডের এই বাঘা ক্রিকেটার দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ফিল্ডিংয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

২। এক সিরিজে রেকর্ড সংখ্যক উইকেট পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের এই বোলার।

৪। প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ৮টি গোল করে তাক লাগিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার এই খেলোয়াড়।

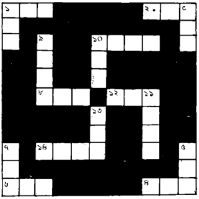
৬। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাট করতে নেমে এই বিশ্বখ্যাত ভারতজাত খেলোয়াড় লাঞ্চের আগে প্রথম সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

৮। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় ইংল্যাণ্ড থেকে আসা লালমুখো সাহেবদের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেছিলেন সদ্য প্রয়াত এই খ্যাতিমান বাঙালী ফুটবলার।

১০। ভারতের হয়ে টেস্ট ম্যাচের আসরে সবচেয়ে বেশী ক্যাচ ধরার রেকর্ড এখনও ধরে রেখেছেন এই অল-রাউণ্ডার।

১২। কলকাতায় জাতীয় ফুটবলে যে কজন ভিন রাজ্যের খেলোয়াড় কলকাতার দর্শকদের মনে দাগ কেটেছিলেন তাদের অন্যতম।

১৪। কলকাতায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে আসা ন্যুইয়র্কের এই দলটির পক্ষে একটি গোল করেছিলেন।



উপর-নীচ

১। ১৯৭৮-এ ঢাকায় এশীয় যুব ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা।

৩। আমেরিকায় বর্তমানে এই খেলাটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৫। হেলসিংকি ওলিম্পিকে তিনটি সোনাজয়ী চেক দৌড়বীর।

৭। একটি টেস্টে ১৯টি উইকেট পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের এই দুর্ধর্ষ স্পিনার।

৯। নিউজিল্যাণ্ডের এই বোলার টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিকের গৌরব অর্জন করেছেন।

১০। ১৯৪২-এ কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলগেটার।

১১। ৩৭ বছর বয়সেও সমান দাপটে ব্যাট করে যাচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের এই ব্যাটসম্যান।

•১৩। মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে সবচেয়ে সফল মহিলা জিমন্যাস্ট।

শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা।

শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃষ্টি ও তার প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের। তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তাঁরা যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তাঁরা পুরস্কার স্বরূপ পঁচিশ টাকা পাবেন। তবে নিজ নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম লিখতে ভুলবেন না।

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান

নাম ____________

অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

বিদ্যালয় ____________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ____________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ____________

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধু সেজে আবার আন্তর্জাতিক খেলাধুলোয় ফিরে আসতে চাইছে

মন্টিয়লে আফ্রিকার দেশগুলি ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর বয়কট করল। পৃথিবীময় এক বিরাট আলোড়ন পড়ে গেল। অনেকে নাক সিঁটকোলেন, খেলার আসরে রাজনীতি আনছে আফ্রিকার দেশগুলি। অনেকে আফ্রিকার কালো মানুষগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীকে সোচ্চার সমর্থন জানালেন।

কী ঘটেছিল সেদিন? পৃথিবী জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার টি'কে থাকা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার যখন সরব, যখন আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর জগত খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের অধিকার সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠনগুলি নাকচ করে দিয়েছে ঠিক সেই সময় মন্টিয়ল ওলিম্পিকের আগে নিউজিল্যাণ্ড রাগবী দল পাঠালে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে।

আফ্রিকার দেশগুলি দাবি করলো, আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি যেন নিউজিল্যাণ্ডের ওলিম্পিকে যোগদানের অধিকার কেড়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ফলে আফ্রিকার প্রতিযোগীরা ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ না করে দেশে ফিরে গেল।

অবস্থা বিবেচনা করে দক্ষিণ আফ্রিকা যেন আসলে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর কোন প্রভেদ নেই।

অথচ ঘোষিত ক্রীড়ানীতির এক নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, শ্বেতকায়, মিশ্রবর্ণ, ভারতীয় ও আফ্রিকেয়রা নিজ নিজ বর্ণের ক্লাবে যোগ দিতে পারবে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

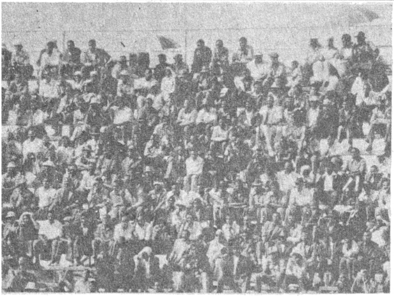
পরের ধারায় আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের পৃথক ক্রীড়া-সংস্থাগুলি সম্ভব হলে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক—এটা হবে বাস্তব এবং আকাঙ্খিত।

ওই ঘোষণাপত্রে ক্লাব পর্যায়ে প্রতিযোগিতাগুলি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেও বলা হয়েছে। সব বা একটির বেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে লিগ ইত্যাদি করতে হলে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রীড়ানীতিতে অদ্ভুত একটি ধারা আছে, সেটি হলো সম্প্রদায়গুলির সংগঠন-সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে বিদেশের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

সব বর্ণের মিলিত ব্যাপার আছে সেগুলি গত পাঁচ বছরে কখনোই অনুসরণ করা হয়েছে বলে বিশ্ববাসী জানেন না। কখনোই ঘোষিত নীতির কোন সুযোগ সুবিধা নিপীড়িত কালো মানুষরা পায়নি, পাচ্ছে না। আসলে শ্বেতকায় সরকার আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখায়ই ব্যস্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মনোবল বাড়ানোর জন্যই এই ঢক্কানিনাদ।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেশাদার ফুটবল লিগে যে দলগুলি খেলে সেখানে সাদা-ক্লাবগুলিতে অবশ্য কালোরা প্রবেশাধিকার পায়। আসলে এটা 'কসমেটিক্স' ধরনের। অথবা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এখানেও কিন্তু 'হোয়াইটস্ ওনলি' (কেবলমাত্র শ্বেতকায়দের জন্য) চিহ্নিত ক্লাবগুলির প্রতি গোপন নির্দেশ আছে, দশ শতাংশের বেশি কৃষ্ণকায় সদস্য না করতে।

কোন গোপনীয় ব্যাপার আলোচিত হয়ে থাকে সাদা সম্প্রদায়ের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সাংবাদিক আর সরকারী অফিসারদের মধ্যে। সেখানে প্রবেশাধিকার কালোরা পাবে যদি




সাদা ও কালো দর্শকদের পৃথক আসন

সরকার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলো। সে বছর সেপ্টেম্বরে তৎকালীন শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রী ভোরস্টারের পক্ষে সে দেশের শাসকদল ন্যাশনাল পার্টি সরকারী ক্রীড়ানীতি ঘোষণা করলো। সঙ্গে এমন কিছু বলার বা ৮ দফা ওই ঘোষিত নীতিতে দেখানোর চেষ্টা হলো,

সপ্তম ধারায় অবশ্য 'সব সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত মিলিত দল' গড়ে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার 'অধিকার' দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় পতাকা নির্বাচিত দলটি 'ব্যবহার' করতে পারবে।

ঘোষণাপত্রের ধারাগুলির মধ্যে যেক্ষেত্রে

ওদের বশংবদ হওয়া যায়। এধরনের দুই ব্যক্তি হলেন, জর্জ থাবে ও রশিদ ভারাচিয়া (দ্বিতীয়জন ভারতীয়)। এদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কাজে সামনে রাখা হয় সমগ্র পৃথিবীটাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, 'দ্যাখো কৃষ্ণকায়রা আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব

করছে !' থাবেকে সরকারের পুতুল সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল কাউন্সিলের সভাপতি এবং ভাল সম্প্রদায় উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আর ব্যবসায়ী রশিদকে প্রচুর টাকা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এদেশে একটি মাত্র বর্ণবৈষম্যহীন সংস্থা, দক্ষিণ আফ্রিকা এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন। ফলে এর সভাপতি মর্গান নাইডু এখন দেশে ঢোকার অধিকার হারিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের (ফিনা) কাছে এক চিঠিতে ইনি এখানকার বর্ণবৈষম্যবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

ফলে ওরা আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছে। বর্ণবৈষম্যহীন ফুটবল লিগ সহ সমস্ত কালোর টুর্নামেন্টে ব্যবসায়ীরা অর্থানুকূল্য দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এই সংস্থা থেকে কিছু ক্লাব সরকার-পুষ্ট জাতীয় পেশাদার সকার লিগে যোগ দিয়েছে। সকার লিগকে 'মেইনস্টে ডিস্টিলার্স' ও 'সাউথ আফ্রিকান ব্রুয়ারি' প্রচুর টাকা জোগায়।

অন্য দেশের কোন খেলোয়াড় বা কর্মকর্তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় এলে ঢালাও আতিথেয়তা পায়। বোধহয় সেই কারণেই ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি থাকা সত্ত্বেও একজন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় আনন্দ অমৃতরাজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত খেলুক চায়—সে দেশের খেলোয়াড়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে টুর্নামেন্ট খেলে।

আসলে এরা এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ঢোকার জন্য যত রকমের ছল চাতুরী সম্ভব করে চলেছে। এখানকার শ্বেতকায় পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি তাতে মদত দিচ্ছে। কিন্তু কালো ক্রিকেটার, টেনিস খেলোয়াড় সবার ভবিষ্যৎ বর্ণবিদ্বেষীরা আটকে রাখছে যতক্ষণ সে ওদের মোসাহেব না হচ্ছে।

আই এফ এ শিল্ড—পুরোনো সেই দিনের কথা

বিপ্লব তালুকদার ঃ তেরোই আগস্ট মোহনবাগান মাঠে রেফারির শেষ বাঁশিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আবিরে রাঙানো মোহনবাগান-প্রেমীদের মুখগুলি খুশীর প্রলেপে জলজল করে উঠল। ছাড়পত্র স্বাক্ষরপর্বের প্রথম দিনটি থেকে যে জল্পনার দোলনা একবার ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের আশা এবং মোহনবাগান-প্রেমীর আকাঙ্খায় দোল খেয়েছে সেই দোলনাটি এদিন মোহনবাগান-প্রেমীদের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। উনআশির লিগের স্বর্ণ শিখর চূড়ায় সবুজ মেরুন পতাকা আর একটিবার জায়গা করে নিল।

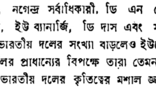
মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলার ফলাফলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা একটু মুষড়ে পড়েছিলেন, তারা এবারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও খেলোয়াড়দের মতই নতুন ভাবে পরিকল্পনায় মেতেছেন। 'লিগে পিছিয়ে পড়েছি তাতে ক্ষতি নেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা বহু ঐতিহ্যের ধারক বাহক আই এফ এ শিল্ড আমাদের চাই-ই।' ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল কেন্দ্র এবং প্রাচ্যের সবথেকে বড় ফুটবল সংস্থা আই এফ এ নিয়ন্ত্রিত এই শিল্ডের খেলা শুরু হয়েছে। এই খেলা শুরুর শুভলগ্নে কিছুক্ষণের জন্য যদি আমরা ইস্ট-মোহনের শিল্ড জেতার তর্কবিতর্কে না গিয়ে শিল্ড শুরুর প্রথম ঘটনাগুলির স্মৃতির দরজা দিয়ে একটু উঁকি মেরে দেখে নিই, তবে মন্দ কি ?

১৮৯২ সালের শেষ দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ঠিক করলেন। ফুটবলের মক্কা কলকাতাতে একটি সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সংগঠিত করবেন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এলেন কলকাতার প্রথম ক্লাব ডালহৌসির সম্পাদক এ ব্রাউন এবং ডালহৌসি ও ক্যালকাটা ক্লাবের দু'জন বিশিষ্ট খেলোয়াড় লিওসে এবং ওয়াটসন। অনেকেই ভাবতে পারেন যে ইউরোপীয় ক্রীড়ামোদীর উদ্যোগেই কি তবে আভিজাত্য ও গর্বের নিদর্শন এই আই এফ এ শিল্ড খেলার প্রবর্তন হয়েছিল ? না তা নয়। শোভাবাজার ক্লাবের পরিচালক এবং সর্বভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর শ্রম ও অধ্যবসায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল শিল্ডের গোড়াপত্তনের ব্যাপারে।

কলকাতার ওয়াল্টার লক এ্যাণ্ড কোম্পানির মারফৎ অর্ডার পেয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান এলকিংটন এ্যাণ্ড কোম্পানি তৈরি করেছিলেন এই শিল্ড। শিল্ড তৈরির ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করেছিলেন পাতিয়ালা এবং কোচবিহারের মহারাজা। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন স্যার আপকার এবং ডালহৌসির আর একজন খেলোয়াড় সাদারল্যাণ্ডও।

লিগের খেলা শেষ হবার পরই আই এফ এ শিল্ডকে কেন্দ্র করে শুরু হত সর্বভারতীয় ফুটবলের মেলা। ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটির সব জাঁদরেল জাঁদরেল মিলিটারি দল, নানা প্রদেশের নানা সিভিল দলও খেলায় অংশ নিত। এখনকার মত তখনো বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহণ করতে আসতো বিভিন্ন জেলা দল।

১৮৯৩ সালের শিল্ড শুরুর প্রথম বছরে সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দু' অঞ্চলে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল—এলাহাবাদ এবং কলকাতাতে। এলাহাবাদ অঞ্চলের বিজয়ী রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস কলকাতা অঞ্চলের বিজয়ী ওয়েস্টার্ন ডিভিসনকে ১—০ গোলে হারিয়ে প্রথম বছরের শিল্ড জিতবার অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় মোট তেরোটি দল অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে একমাত্র ভারতীয় দল ছিল শোভাবাজার ক্লাব। শোভাবাজারের হয়ে খেলেছিলেন কালী মিত্র, কালী মুখার্জি, মুক্তিদা রায়, নগেন্দ্র সর্বাধিকারী, ডি এন চৌধুরী, মতিলাল, এম দাস, এ পাল, ইউ ব্যানার্জি, ডি দাস এবং সূর্যকান্ত দাস। পরের বছর থেকে ভারতীয় দলের সংখ্যা বাড়লেও ইউরোপীয় মিলিটারি ও সিভিল দলগুলির প্রাধান্যের বিপক্ষে তারা তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ভারতীয় দলের কৃতিত্বের মশাল জ্বালিয়েছিলেন মোহনবাগান ক্লাব। সেই ১৯১১ সালের ঘটনা আজকে নিশ্চয়ই নতুন করে না বললেও চলবে। তবে এর পরেও আরও বেশ কয়েক বছর ধরে শিল্ডের দৌড়ে ছিল ইউরোপীয় দলের আধিপত্য। সেই আধিপত্যকে ভারতীয় দল হিসেবে করায়ত্ব করেছিলেন মহমেডান স্পোর্টিং কাব ১৯৩৬ সালে। ইস্টবেঙ্গল দল সর্বপ্রথম শিল্ড জয়ী হয় ১৯৪৩ সালে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হল কলকাতা ফুটবলের তিন প্রধানের শিল্ড জিতবার প্রথম বছরের হিসেব। এরপর ভারতীয় ফুটবল-সমুদ্রে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আই এফ এ শিল্ডের দৌড়ে এখন শুধু ইস্ট-মোহনের পাঞ্জা কষার লড়াই। লিগ শেষ। এখন শুধু শিল্ডের হিসেব। কলকাতার ঘরোয়া ফুটবলে লিগ জেতার থেকে শিল্ড জেতার গৌরবও কিছু কম নয়। তাই সমস্ত ফুটবল-প্রেমীর এখন শুধু আশার সুতোয় কল্পনার জাল বোনার পালা। এই মুহূর্তে একমাত্র ভাগ্যলক্ষ্মীই জানেন শিল্ডের বরমাল্য কার গলায় ঝুলবে-লাল-হলুদের না সবুজ-মেরুনের ?



সাব্বিরের তৃতীয় হ্যাটট্রিকের জন্যেই কি তিনটি গোল হজম করেছে ইস্টবেঙ্গল ?

ইস্টবেঙ্গল—৩ জর্জ টেলিগ্রাফ—৩
(সাব্বির আলি—৩, হ্যাটট্রিক)

(বিভাস সরকার, বাদল ভট্টাচার্য-২)

১৪ আগস্ট শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে ৩—৩ ড্র রেখে ২২টি খেলায় ৪১ পয়েন্ট পেয়ে ইস্টবেঙ্গল ১৯৭৯-তে অপরাজিত লিগ রানার্স হল।

ইস্টবেঙ্গল-জর্জ টেলিগ্রাফের এদিনের খেলায় একটিই আকর্ষণ ছিল—সাব্বির আলি সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হ্যাটট্রিক করতে পারে কি না। লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ফয়সালা হয়ে গেলেও এই একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে মাঠে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার দর্শক হাজির হয়েছিলেন। এবং এক্ষেত্রে তারা নিরাশ হননি। সাব্বির আলি আজ তিনটি গোল করে মানস ভট্টাচার্যের সঙ্গে এবছরের লিগে যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব পেল। এছাড়া সাব্বির দলের পক্ষে একাই তিনটি গোল করে এদিন হ্যাটট্রিকও করেছে। এটা এই মরশুমে তার তৃতীয় হ্যাটট্রিক। কলকাতার ফুটবল লিগ ইতিহাসে এর আগে কোনো খেলোয়াড় এক মরশুমে তিনটি হ্যাটট্রিক করতে পারেনি। সাব্বির করল। এটা রেকর্ড। এবার ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে আরও একটি হ্যাটট্রিক হয়েছে এবং সেটি মিহির বসুর।

কিন্তু সাব্বিরের যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতা হবার এবং হ্যাটট্রিক করার ফাঁকে ইস্টবেঙ্গলকে আজ একটি পয়েন্টও খোয়াতে হয়েছে। জর্জ টেলিগ্রাফ অপর দু'প্রধানের সঙ্গেও এবার লড়েছে, আজও ভালো খেলেছে। তবু আগের ম্যাচে যে টিমটা হাওড়া ইউনিয়নের কাছে চার গোল খায়, তার পক্ষে ইস্টবেঙ্গলকে তিন গোল দেওয়া খুবই বেমানান ঠেকে। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগান ছাড়া এবং সাম্প্রতিককালে কোন দলই ইস্টবেঙ্গলের জালে তিনবার বল ঢোকাতে পারেনি। আজকের তিনটির মধ্যে অন্তত দুটি গোলের ক্ষেত্রে গোলরক্ষক অমিত গুহ দায়ী ছিল। মহমেডানের বিপক্ষে অল্প গোলরক্ষা প্রশংসা পেলেও এদিন সে মোটেই আশানুরূপ খেলতে পারেনি। জর্জের কৃতিত্ব, গোল খেয়ে দমে না গিয়ে পরমুহূর্তেই

ওরা গোল শোধ করে দিয়েছে। রমেন ভট্টাচার্যের যোগদানে জর্জের রক্ষণ কিছুটা বাড়তি শক্তি পেয়েছিল। তবু সাব্বিরের গোলসংখ্যা বাড়ানো উচিত ছিল। অন্তত দুটি সহজ গোলের সুযোগ সে নষ্ট করেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুরজিতের চমৎকার সাজানো মাইনাসে ঠিকমত পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল ছিল। কিন্তু সে পারেনি। হরজিন্দার সিং এদিন প্রথম পুরো সময় খেলল। এবং মোটামুটি ভালোই খেলেছে। তবে টেন্ট থেকে মাঠ এবং মাঠ থেকে টেন্ট তাকে বিশেষ পুলিশ প্রহরায় যেতে হয়। সঙ্গে মনজিতও ছিল। শেষ খেলায় এক পয়েন্ট হারালেও ইস্টবেঙ্গল সদস্য-সমর্থকরা নীরবে মাঠ ছেড়ে চলে যান এই সান্ত্বনায় যে, সাব্বির হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়েছে এবং যুগ্মভাবে হলেও সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানও পেয়েছে।

প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকে এক-গোলে। তিন মিনিটে মনোরঞ্জনের বাড়ানো থ্রু নিয়ে দ্রুত বক্সে ঢুকে পড়ে সুরজিৎ যখন সট করতে উদ্যত, তখন সঞ্জীব চৌধুরী তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। পেনাল্টি থেকে সাব্বির গোল করে। এই অর্ধে অধিনায়ক প্রশান্তর একটি অসাধারণ সট ক্রশ-পিসে লেগে উড়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে মাঠে প্রথম চমক জাগে। পেনাল্টি বক্সের কিছুটা ডান পাশ থেকে বিভাস সরকারের সোয়ার্ভ করানো তেজী ফ্রি-কিক সটটি অমিতের হাতে লেগে গোলে ঢোকে। বলটা ঠিক মত ফিস্ট করতে পারলে বারের উপর দিয়ে যাবার, সম্ভাবনা ছিল।

১৭ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় গোল দেয়। হারজিন্দার ব্যাক পাস করে ম্যাথুজকে, ম্যাথুজ দেয় সুরজিতকে। সুরজিৎ বলটা এগিয়ে নিয়ে গোলের দিকে তুলে দেয়। বিশ্বজিৎ দাস পাঞ্চ করে। ফিরতি বলে সাব্বির সেটা গোলে ঠেলে দেয়। রমেন পা দিয়ে গোলটা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জর্জ গোল শোধ করে। মণীশের কর্নার থেকে বাদল ভট্টাচার্য হেড করে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণের দু-একজন খেলোয়াড় এবং গোলরক্ষক বলের গতি ঠিক-মত আন্দাজ করতে পারেনি। বল জালে।

দু'মিনিটের মধ্যে সাব্বিরের এবং ইস্ট-বেঙ্গলেরও তৃতীয় গোল হল। বক্সের কয়েক গজ বাইরে রমেনের হাতে বল লাগে। সুরজিৎ অতি দ্রুত ফ্রি-কিক থেকে সাব্বিরকে বল ঠেলে দেয়। সাব্বির বল ধরেই একটু এগিয়ে বিশ্বজিতের মাথার উপর দিয়ে জালে পাঠায়। জর্জের খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ জানায়। ওদের আপত্তির কারণ এই—রেফারি বাঁশী বাজাবার আগে এবং খেলোয়াড়রা অপ্রস্তুত থাকা অবস্থায় সুরজিৎ ফ্রি-কিক করেছে।

ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলের কিছুক্ষণের মধ্যেই জর্জের তরফে গোল শোধ। ডান প্রান্ত ধরে বল নিয়ে দ্রুত ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকে মণী-। মান্না সেণ্টার পাঠায়। অমিতের হাত ছিটকে বলটা বেরিয়ে আসা মাত্র চলতি বলে ভলি করে বাদল বল জালে ঢোকায়। জর্জ টেলিগ্রাফও এদিন লিগের খেলা শেষ করল ২২টি ম্যাচে ২২ পয়েন্ট পেয়ে।



সাব্বিরের দ্বিতীয় গোল—পেছনে বিশু ও সুরজিত এবং পাশে গোলকীপার বিশ্বজিত ও হরজিন্দার / অরুণ

মহঃ স্পোর্টিং-১ ঃ পোর্ট ট্রাস্ট-০

(দীনকর)

১১ আগস্ট ঃ পোর্ট ট্রাস্ট অবনমনের কবলে পড়ে গেল। ইস্টার্ন কম্যাণ্ড যেহেতু লিগে অংশই নেয়নি, তাই ওরা নেমে গেছে, নেমেছে পুলিশও। পোর্ট নামল তৃতীয় দল হিসাবে। চতুর্থ আর একটি দল নামবে এবং সেটা কোন্ দল, তা এই লেখা বেরোবার আগেই ঠিক হয়ে যাবে। গতবারের লিগ কোঠায় সপ্তম স্থানাধিকারী পোর্ট ২২টি ম্যাচে এবার মাত্র ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এবং আগামী বছর থেকে পোর্টকে আবার খোলা মাঠে খেলতে হবে।

পোর্ট লিগের শেষ খেলায় এক গোলে হেরেছে মহমেডানের কাছে। অত্যন্ত সাদা মাটা খেলা হয়েছে। ইচ্ছে করলে মহমেডান আরও গোল দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি। মহমেডান লাইন-আপে এদিনও বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। হাবিব এবং লতিফুদ্দিন অনুপস্থিত। পোর্টের তপন দাস বেশ কয়েকদিন পর আবার মাঠে নামল। এরিয়ানের বিপক্ষে সে খেলেছিল, এদিন সে মাঠে নেমে তার কিছু সহজাত দক্ষতা দেখায়, দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিট নাগাদ সে অবশ্য মাঠের বাইরে চলে আসে। পোর্টের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা আজ প্রচুর অফ-সাইড করেছে।

মহমেডান দিনের একমাত্র গোলটি পায় প্রথমার্ধের তেইশ মিনিটে। ফিলিপ ওভার ল্যাপ করে উঠে এসে সুভাষ রায়কে মাইনাস করে। সুভাষ বল ধরেই গোলের সামনে তুলে দেয়। সুরিন্দর কুমার এবং পোর্টের রাইট স্টপার গৌতম দত্ত—দুজনেই বলটির দখল নিতে যায়। কিন্তু পারে না। বল চলে আসে ফাঁকায় দাঁড়ানো দীনকরের কাছে। গোলরক্ষক পীযূষ এই সময় জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দীনকরের পক্ষে ফাঁকা গোলে বলটা ঠেলতে কোনই অসুবিধা হয় না। সুভাষ রায় এদিন অনেক চান্স নষ্ট করেছে। ভালো খেলেছে অমলরাজ।



একমাত্র গোলটি করে সুরীন্দার /. পাহাড়ী

মহমেডান স্পোর্টিং-১ রাজস্থান-০

(সুরিন্দরকুমার)

১৬ আগস্ট ঃ লিগের শেষ খেলায় রাজস্থানকে এক গোলে হারিয়ে মহমেডান পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলল। এদিনই ছিল ৭৯-র ফুটবল লিগের শেষ দিন। মহমেডান এবারও যথারীতি লিগ কোঠার তৃতীয় স্থানটি দখল করেছে। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অমল দত্ত কোচিংয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর দলের ভূমিকার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, মহমেডান গতি পেয়েছে। এবার ওরা ড্র করেছে ক্যালকাটা জিমখানা, জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে, হেরেছে মাত্র একটি ম্যাচে মোহনবাগানের বিপক্ষে। ২২টি খেলায় পেয়েছে ৩৯ পয়েন্ট। গতবার মহমেডানের অর্জিত পয়েন্ট সংখ্যা ছিল ২২টি ম্যাচে ৩৬।

মহমেডান-রাজস্থানের আজকের খেলাটি ছিল মাঝারিয়ানায় আবদ্ধ, মাঝমাঠে সীমাবদ্ধ। তারই মাঝে মহমেডান কয়েকটি সুযোগের সৃষ্টি করেছিল। তবে সব চেয়ে সহজ সুযোগটি পেয়ে গিয়েছিল রাজস্থান প্রথমার্ধে ১৩ মিনিটের মাথায়। কিন্তু প্রীতির হেড করা বলটা নাসিরের গায়ে লাগে। পর মুহূর্তেই সে কোনরকমে বলটা ধরে নেয়। প্রথমার্ধের শেষ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামে এবং কিছুক্ষণ তা চলে। এই বৃষ্টি মাঠকে অতিশয় পিছল করে দেয়।

মহমেডান লাইন আপে এদিন বেশ বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। হাবিব এবং লতিফুদ্দিন তো বটেই, ফিলিপ ও সমরেশও এদিন অনুপস্থিত ছিল। মইদুল হাফে খেলে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সুজাতের জায়গায় সমরেশ স্ট্রাইকারের জায়গায় খেলতে নামে।

মহমেডান দিনের একমাত্র গোলটি পায় সেকেণ্ড হাফের প্রায় শুরুতেই। ডান প্রান্ত থেকে গড়ে ওঠা একটি আক্রমণের পর বল বাঁ দিকে চলে আসে। দীনকর বলটা ধরে গৌরাঙ্গকে ব্যাক পাস করে। কালবিলম্ব না করে গৌরাঙ্গ গোলের দিকে পাঠায়। রাজস্থান গোলরক্ষক শেখ আখতারুদ্দিন গ্রিপ করতে গিয়ে বল ফস্কায় পাশেই দাঁড়ানো সুরিন্দর আস্তে করে বল জালে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্থানের একটি পরিবর্তন হয়। বিভু রায়ের জায়গায় আসে প্রণব ভৌমিক। তবে দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের একটি পরিবর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোলরক্ষক আলমগীরকে জার্সি খুলিয়ে কালো সাদা জামা পরিয়ে শেষ পাঁচ মিনিটের জন্য আক্রমণভাগে খেলতে নামানো হয় সুরিন্দরকুমারের জায়গায়।



সুজাতের সট পীযূষ ডাইভে ধরে / পাহাড়ী

মাঠে এত দর্শক ঢুকলো কেমন করে ?



দর্শকদের আদরে মানস দিশেহারা/পাহাড়ী



কার্টুন ঃ আলি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ১৩ আগস্ট

একমাত্র সামরিক বাহিনীর লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট আসন একটু খালি, তাছাড়া যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। গ্যালারি উপচে পড়া দর্শকদের ভিড় মাঠ পর্যন্ত দখল করেছে। হাজার হাজার মানুষের দমঠাসা ভিড় থেকে মাঝখানের সবুজ আয়ত-ক্ষেত্রটি কি করে ফাঁকা ছিল সেটাই বিস্ময়।

উৎসাহী জনগণ যেভাবে বারবার মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাতে সংশয় দেখা দিয়েছিল খেলা শেষ পর্যন্ত হতে পারবে কিনা। সদস্য আসনের দিকে সাইড লাইনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে বল থ্রো ইন করার জন্য দর্শকরা একটু সরে জায়গা করে দিয়েছে।



পুলিশের সামনে ফেন্সিং ডিঙিয়ে মাঠে/পাহাড়ী

গোলের পর বীরপূজা কলকাতা মাঠে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই ম্যাচে নির্বাধে দর্শক মাঠে ঢুকে শ্যাম বা মানসকে উত্যক্ত করেছে। বেশ কয়েকবার দেখা গেছে সাইড লাইনের পাশ থেকে শৈলেন মান্নাকে উঠে এসে অবস্থা সামাল দিতে।

কিন্তু প্রশ্নটা হল এত বাড়তি লোক ঢুকল কি করে? প্রায় হাজার পনেরো বাড়তি প্রবেশপত্র কে বা কারা বিতরণ করলো? মাঠের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ না হলে অর্থাৎ মোহনবাগান কোন কারণে ড্র করলে বা পরাজিত হলে, দু'দলের খেলোয়াড়দের ওপরই হামলার আশঙ্কা ছিল। পরিস্থিতি বিচার করে মনে হয় না তেমন কিছু ঘটলে পুলিশ খেলোয়াড়দের জান-মানের দায়িত্ব নিতে পারত। পুলিশ এ ম্যাচে বিক্ষিপ্তভাবে একটু আধটু লাঠি ঘোরানো ছাড়া মনোযোগী দর্শকের মত খেলা দেখেছে।

খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত শতকরা নব্বই ভাগ দর্শক স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধে চুপচাপ থেকেছে। কিন্তু শেষ বাঁশী বাজার পর একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা। কারোর চোখের চশমা উধাও হল, এক পাটি হারিয়ে যাওয়া চটির খোঁজে কত লোক বিব্রত হল, কেউবা মানিব্যাগ হারিয়ে মুখ কালো করল। দুজন ফটোগ্রাফারের সরকারী কার্ড কারা ফাঁক তালে পকেট থেকে তুলে নিল। আর পুলিশ এসব কিছু মন দিয়ে দেখে, তৃপ্ত চিত্তে সন্ধ্যে-বেলা ভ্যানে করে ডেরায় ফিরে গেল। তাদের ডিউটি শেষ।

এখানে ওখানে

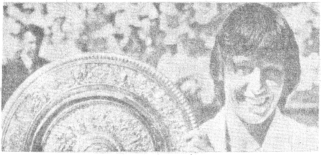
বর্গকে কি করে হারানো যায়

একটানা চারবার উইম্বলডন বিজয়ী বিয়র্ন বর্গকে কি করে হারানো যায় তা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চয় খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। এবারের উইম্বলডন ডাবলস বিজয়ীদের অন্যতম জন ম্যাকেনরো সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিলেন তার পার্টনার পিটার ফ্লেমিং-কে। ফ্লেমিং-এর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'কেন, বর্গকে আক্রমণ করে।'

এক সাংবাদিকের কানে কথাটা যাওয়ায় তিনি ফ্লেমিং-কে চেপে ধরলেন, 'কখন কিভাবে আক্রমণ করবে, কি তোমার স্ট্র্যাটেজি ?' সাংবাদিক আশা করছিলেন দারুণ কিছু একটা টেকনিক্যাল আলোচনা শুরু হবে এবার। কিন্তু ফ্লেমিং-এর জবাব খুব সংক্ষিপ্ত, 'এ আর এমন কি কঠিন, কোর্ট বদল করার সময় জায়গা মাফিক আচ্ছা এক র‍্যাকেটের বাড়ি।' বিস্মিত সাংবাদিক উত্তর শুনে হাঁ করে আছেন দেখে ফ্লেমিং বললেন, 'সরি ! বর্গকে হারাবার এর চেয়ে সহজ বা অন্য কোন পন্থা আমার জানা নেই।'

নাভ্রাতিলোভার মনের কথা

টেনিস জগতের শীর্ষস্থানীয়া মহিলা—খেলোয়াড় পরপর দু'বার উইম্বলডন খেতাব জয়ী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা বিলেতের অবজার্ভার পত্রিকার (৮ জুলাই '৭৯) সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন,



'ক্রিস এভার্টকে আমি লক্ষ্য করতাম। তার মত হতে চেষ্টা করতাম, সে যে যে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে, মনে মনে সে সব প্রতিযোগিতায় জয়ের কথা ভাবতাম। তার সমান কি করে হবো, সেটা আমার ঠিক জানা ছিল না। তবে একদিন না একদিন তার সমকক্ষ যে হবো, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। এভার্টের সাফল্যকে মনে মনে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলাম বলেই, সংবাদের শিরোনামে আসতে পেরেছি। এভার্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

কো-র ৮০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড

সেবেস্টিয়ান কো ৮০০ মিটার ১ মিনিট ৪২.৩৩ সেকেণ্ডে দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। পুরনো রেকর্ড ছিল কিউবার এ্যালবার্টো জুয়ানতোরেনার ১ মিঃ ৪৩.৪ সেকেণ্ড। সেই দৌড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কো বলেছেন, 'প্রায় অবর্ণনীয় ব্যাপার। অসলোর বিসলেট স্টেডিয়ামের ৫ জুলাইয়ের স্মৃতি আমার মনে সারাজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সমাপ্তি রেখায় পৌঁছে আমি ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে হাঁটু দুটো ধরলাম। মাটিতে গড়িয়ে পড়ছিলাম, কে যেন শরীরটাকে তুলে ধরল। মুখ তুলে দেখলাম এ্যালান প্যাস্কো ঘড়ি দেখছে ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে। আর সে মুহূর্তে সারা স্টেডিয়াম দর্শকের চিৎকারে ফেটে পড়ল। কি ঘটেছে তখনো আমি তা জানিনা, দর্শকদের এমন উল্লসিত চিৎকারও আমি কখনো শুনিনি। আমি হতভম্ব হয়ে এ্যালানের দিকে তাকালাম, ও আমার দিকে দেখে আর একবার ঘড়িটা দেখল। তারপর হাসিমুখে বলল,'১ মিনিট ৪২.৩৩ সেকেণ্ড', সে মুহূর্তে সবকিছুই (অর্থাৎ জীবনের) বদলে গেল।'



ফুটবলার ঃ কলকাতা ময়দানের শিবিরে শিবিরে এখন ক্লান্তভাব। ক'দিন আগেকার চনমনে ভাবটা সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে না। শিবিরের সৈনিকদের মনে কেমন যেন ছুটির আমেজ। ভিন রাজ্যের প্রায় সকলেই আপন ঘরে ফিরে গেছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্য।

মহমেডান অধিনায়ক হাবিব দেশে ফিরে গেছে ইস্টবেঙ্গলের খেলার পরদিনই। নাজিবও এখন দেশে। কিন্তু দীনকর ও ফিলিপস দেশে যাবে না, ওরা এই ছুটির কদিনও কলকাতা থেকে প্র্যাকটিশ করবে। অশোক চক্রবর্তী দুর্গাপুরের ছেলে, ও দলের শেষ খেলার পরেই বাড়ি যাবে ক'দিনের জন্য।

সাব্বিরকে ধন্যবাদ জানালাম হ্যাটট্রিকের রেকর্ড করবার জন্য। ও বলল 'ধন্যবাদ, আমি পেরেছি।'

এর-আগের সংখ্যা খেলার আসরে সাব্বির সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা হতে পারবে কিনা এ নিয়ে যে লেখা বেরিয়েছিল, সাব্বির কৌতুক করে বলল--'দাদা লেখাটা কি রি-রাইট করবে?' জর্জের সঙ্গে খেলার আগের দিন ওকে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। বিনয়ী ও ভদ্র ছেলে, বলল—'দাদা মনটা ছটফট করছে বাড়ি যাবার জন্য, খেলা শেষ হলেই পালাব। কয়েকদিন মা-বাবার কাছে কাটিয়ে আসব।' 'কবে ফিরবে?' '২৭-২৮ তারিখ।' 'কেন টিমের সঙ্গে নেপাল যাচ্ছ না।' 'না দাদা বাড়ি যাব।' বলে আবার হাসি। সাব্বিরের বাড়িতে মা-বাবা ছাড়াও দুই দাদা, দুই বৌদি ও বড়দার দুই ছেলে-মেয়ে রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের আরেক তারকা দেবরাজ দেশে ফিরে গিয়েছিল এক অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রে। ও এখনও ফেরেনি। কবে ফিরবে? কেউ বলতে পারছে না। গুরদেব, মনজিত কলকাতা থাকলেও একটু গা-ঢাকা দিয়ে প্রায় ছুটি কাটাবার মুডে আছে। হরজিন্দর কলকাতায় আছে এখনও, কিন্তু ওরা দেশে যাবে কিনা এটা জানা যাবে না কারণ সাংবাদিকদের সঙ্গে ওরা কথা বলবে না। কর্মকর্তারা নাকি তা পছন্দ করেন না। তবে ওরা সবাই ফিরে আসছে ২৪/২৫ তারিখের মধ্যে কারণ ওই সময় টিম নেপাল যাচ্ছে প্রদর্শনী খেলা খেলতে।

নেপাল খেলতে যাবে মোহনবাগানও। তাদের যাবার কথা ১৯ তারিখে। কিন্তু কলকাতার ছেলেরা ছাড়া হাতের কাছে কেউ নেই। এরিয়ানের সঙ্গে খেলার পরেই পায়াস শ্যাম দেশে চলে গেছে। বিদেশ সুব্রত ওদের দেশের বাড়িতে। এছাড়া দু'একজন টুক করে ঘুরে আসব এই মনোভাব নিয়ে এখানে ওখানে সরে পড়েছে। কোচ পি কে চিন্তিত—'দেখ কি ব্যাপার! এখন এরকম ঢিলে দিলে চলে? নেপালে যাওয়া হবে কিনা জানি না। যদি যেতেই হয় তবে একটু প্রস্তুতি দরকার। আবার ফিরে এসেই তো শিল্ডে প্রস্তুতি। সম্ভবত ৬ তারিখেই (সেপ্টেম্বর) আমাদের খেলা। কি মুস্কিল বল তো! ছেলেরা বোঝে না। গতবছরও আমি এরকম বিপদে পড়েছিলাম।'

'নেপালে ক'দিনের ট্যুর?'

'১৯ থেকে ২৪ তারিখ।'

'আপনি যাচ্ছেন তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে ঝামেলা তো প্রচুর।' পি কে-র উত্তর।

কলকাতার ফুটবলে সবচেয়ে উপেক্ষিত দর্শকরা। বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ, আই এফ এ কর্তৃপক্ষ ও মহামহিম চরম শক্তির আধার পুলিশ বাহিনী সকলেই ময়দানে স্ব-মহিমায় বিরাজ করে। এরা কেউ হতভাগ্য দর্শকদের কথা চিন্তা করতে নারাজ। সে সময়ও বোধহয় নেই ওদের। কলকাতা ময়দানের মাটির চরিত্র নির্ভেজাল এটেল। জল পড়তেই গলে কাদা এবং একটু মাখামাখি করলে 'দই'। প্রচণ্ড বর্ষায় ও বর্ষার পরে জমে থাকা জলের মধ্যে দর্শকরা এসে টিকিটের লাইন দেন প্রতিদিন। পায়ের চাপে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় তা মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল মাঠের সবুজ গ্যালারির প্রতিটি গেটে গেলেই দেখা যায়। কাদায় অনেক সময় পায়ের পাতা ডুবে যায়। ওর মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে অসীম ধৈর্যধর দর্শকরা আর মহামহিম পুলিশ মাঝে মাঝে এসে কারণে অকারণে উত্তক্ত করে যান। কারণ তারা তো অশ্বারূঢ়, অসুবিধা কি। দিনের পর দিন এই ব্যাপার। জানিনা এ নিয়ে আমাদের দর্শকরা কি ভাবেন। কেন তারা সোচ্চার হন না।

মোহনবাগানের কোন এক মাঝারি কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওটা নিয়ে তারা কিছু ভাবছেন কিনা। তার উত্তর—'ওটা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। আমরা মাঠটাই দেখতে পারি মাঠের বাইরে যেতে পারি না।

তবে এটা কে দেখবে, সরকার? অনেক কষ্টে জলের ব্যাপারে সরকারের ঘুম ভেঙেছে বা আধমুখো অবস্থা। কেবলমাত্র মোহনবাগান মাঠে দু'চারটে কলের মুখ দিয়ে জল পড়ে, ইস্টবেঙ্গল মাঠে তাও নয়—তবে রাস্তার উপরে 'পানীয় জল' মার্কা বিরাট এক ট্যাঙ্ক থাকে, দর্শকরা সেখান থেকে জল খেতে পারে। এতে সবুজ গ্যালারির 'পাগল' দর্শকদের কতটা সুবিধা হয় জানি না। এই তো জলের অবস্থা। জল-কাদার সমস্যা বোধহয় তাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। কারণ ওতে দর্শকদের ঘড়ি আংটি বা খুচরো পয়সা হারালেও প্রাণ হারানর প্রশ্ন নেই। কাদায় দাঁড়িয়ে থাকলে কি কেউ অজ্ঞান হয়? হয় না। তাহলে অত ভাববার কি আছে

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৬১৮ ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

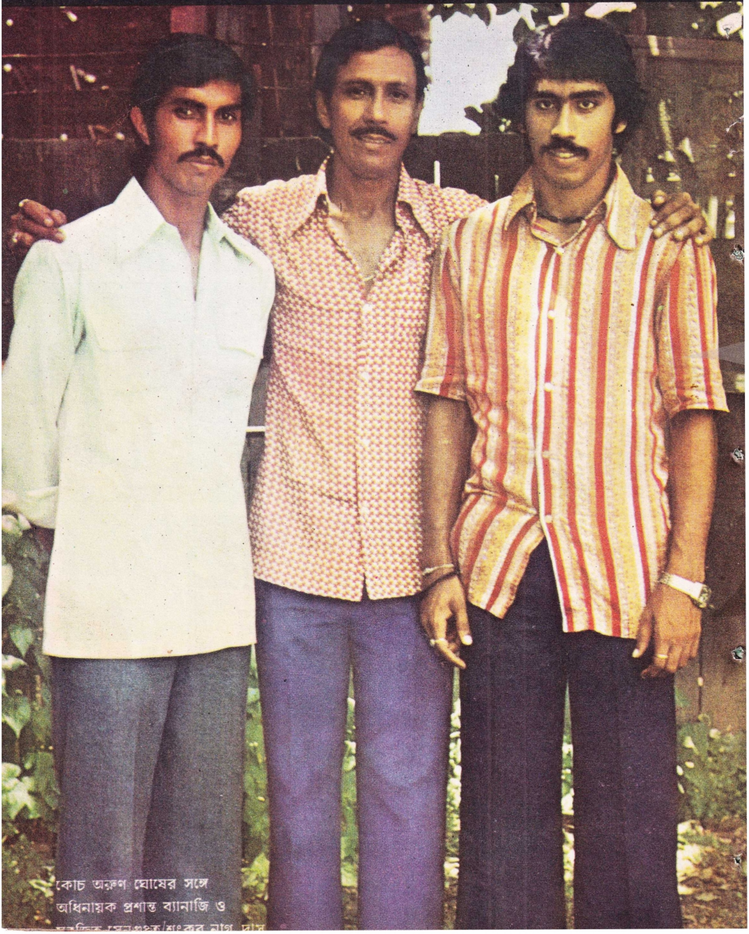
জয় ফুটবল জয়

(কুড়ি)

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 24th August 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



কোচ অরুণ ঘোষের সঙ্গে
অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি ও